১১৩৫৭

চরিত-কথা

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল রচিত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর
পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৩

All rights reserved by the publisher.

মূল্য ১।০ টাকা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১
অশ্বিনীকুমার দত্ত	...	...	৫৮
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৮৯
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	...	...	১২৪
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	...	...	১৪৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	১৯৫
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	...	...	২১৫
স্বর্গীয় উইলিয়েম টি, ষ্টেড্‌	...	...	২৩৩
স্যার তারকনাথ পালিত	...	...	২৬৭
টাইট্যানিকের তিরোধান	...	...	২৭৬

চরিত-কথা

সুরেন্দ্রনাথ

আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনে সুরেন্দ্রনাথের স্থান

সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও অনেক শক্তিশালী লোকনায়ক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কোনও কোনও বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁদের সকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাই আপন আপন প্রদেশেতে আবদ্ধ। লালা লাজপত্ রায়ের নাম ভারত-বিশ্রুত হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র, প্রকৃত পক্ষে, পঞ্চনদের সীমা অতিক্রম করে নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল এলাহাবাদ ও আগ্রার যুক্ত-প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেই কতকটা নেতৃত্ব-মর্য্যাদা পাইয়াছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে অনেকেই তাঁর নাম জানে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভার বা কর্ম্মজীবনের প্রেরণা অনুভব করে নাই। স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতার আসন্নবন্ধুবর্গ যাহাই বলুন না কেন, তাঁর রাষ্ট্রীয়-নেতৃত্বও বোম্বাইএর পার্শী ও গুজরাটের বেনিয়া সম্প্রদায়েই সাক্ষাৎভাবে স্বীকৃত হয়; বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় সমাজ, কিম্বা বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তবে কন্‌গ্রেসে বা জাতীয়

মহাসমিতিতে কিছুদিন পর্য্যন্ত যে তাঁর একটা অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর ইহার হেতুও একরূপ চক্ষের উপরেই পড়িয়া আছে। জন্মাবধিই কন্‌গ্রেস স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতা, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এল্যান্, ও হিউম্ এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডার্‌বর্ণ, ইহাঁদের অর্থেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অনেক সময় কন্‌গ্রেসের অপরাপর নেতৃবর্গ কন্‌গ্রেসের ব্যয় সংকুলনের জন্য আপনাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা যথাসময়ে আদায় করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া এই চারিজনকেই বহুদিন পর্য্যন্ত এই অনাদায় টাকার দায়ভারও বহন করিতে হয়। এ অবস্থায় যাঁহাদের কার্পণ্যে বা ঔদাসীন্যে স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতাকে বৎসর বৎসর এত টাকার ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কন্‌গ্রেসের কার্য্যকলাপে মেহেতা সাহেবের অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। মেহেতা সাহেবের নিকটে কন্‌গ্রেসের এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ন-ঋণ স্মরণ করিয়াই, অপরাপর নেতৃবর্গ কন্‌গ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় তাঁর অভিমত ও আবদার মানিয়া চলিয়াছেন। কন্‌গ্রেসের অন্যতম উত্তমর্ণ বলিয়াই কন্‌গ্রেস্-মণ্ডপে স্যার ফিরোজশাহ মেহেতার একটা প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা কন্‌গ্রেসের বাহিরে, দেশের সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকর্ম্মের উপরে, কিম্বা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিত্তে, মেহেতার চরিত্রের বা প্রতিভার কোনোই প্রভাব কখনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কোনো কোনো বিষয়ের আলোচনায়, অপরাপর সভ্যগণের তুলনায়, কখনো কখনো, অসাধারণ সাহসিকতার ও বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ প্রদান করিয়া, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ

গোখেলে ভারতব্যাপী একটা খ্যাতি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, সত্য। আর এ খ্যাতি ও মর্য্যাদা তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও অতিশয় সত্য। গোখেলে সদ্বিদ্বান, ও কোনো কোনো বিদ্যায় স্বল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞতাও তাঁর আছে। য়ুরোপীয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে গোখেলের যে পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের আর কোনো লোক-প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কের তাহা আছে কি না সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বনে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার-আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে পরমতখণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখেলে একরূপ সিদ্ধহস্ত। ইংরেজের চিরাভ্যস্ত বাদ-বিদ্যায় ইংরেজিতে ইহাকে ডিবেট (Debate) বলে—লাট কার্জ্জনের মত পারদর্শী লোক ইংলণ্ডেও এখন কম। অথচ কখনো কখনো এই লাট কার্জ্জনকেই এ বিষয়ে গোখেলের নিকটে হার মানিতে হইয়াছে। আর আপনার বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখেলে এ পর্য্যন্ত যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে এই সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ভারতের অন্য কোনো লোকনায়কের মধ্যে সেরূপ ঐকান্তিকী নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। গোখেলের মধ্যে যে সকল গুণের সমাবেশ হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অন্য কোনো প্রসিদ্ধ লোকনায়কের মধ্যে সে মাত্রায় দেখা যায় নাই ; ইহা সত্য বটে, কিন্তু তবুও গোখেলের বর্ত্তমান ভারতব্যাপী খ্যাতি যে কেবল তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্র বলেই অর্জ্জিত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যদি গোখেলেকে হাতে ধরিয়া না তুলিতেন ; পুনার সার্ব্বজনীন সভা যদি, রাণাডের অনুরোধে, গোখেলেকে ওয়েল্‌বী কমিশনের সম্মুখে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিতেন ; প্রথম বারে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বিলাতী সংবাদপত্রে, প্লেগ-বিধানের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পুনার ইংরেজ

সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন, গোখেলে যদি জাহাজ-ঘাটেই সর্ব্বতোভাবে তার প্রত্যাখ্যান করিয়া বোম্বাইএর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহভাজন না হইতেন ; ফিরোজশাহ মেহেতার শিষ্যত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহারই প্রসাদে, যদি তিনি বোম্বাই-ব্যবস্থাপক-সভার বে-সরকারি সভ্যগণের প্রতিনিধি হইয়া বড় লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় না আসিতেন ; সেখানে লাট কার্জ্জন আপনার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে যদি গোখেলের বিচারযুক্তির যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াই, যদি তাঁর মেধার ও পাণ্ডিত্যের সম্বর্দ্ধনা না করিতেন ; ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরমপন্থীদিগের অভ্যুদয় হইলে, মিণ্টো ও মর্লে প্রভৃতি ভারত-শাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা যদি এই নূতন রাষ্ট্রীয়-শক্তিকে সংযত ও প্রতিহত করিবার জন্য গোখেলে ও তাঁর দলের লোকনায়কগণকে লোক-চক্ষে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা না করিতেন ;—এই সকল বাহিরের ঘটনাপাত না হইলে, গোখেলে যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার বা চরিত্রের বলে, ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এ সকল যোগাযোগ সত্ত্বেও গোখেলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল এক সুরেন্দ্রনাথই এই দেশে, এই কালে, এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্বের দাবী করিতে পারেন।

যে সকল বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগে এ দেশের অপরাপর কর্ম্মনায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে নাই। রাজপুরুষদিগের আসন্নসংসর্গ-লাভ এ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ।

আর এ দেশে ধনবলে ও পদবলেই রাজপুরুষদিগের প্রসাদলাভ করিতে পারা যায়। আজ লোকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভসময়ে সুরেন্দ্রনাথের এ ধনপরিবাদ ছিল না। গোখেলেকে রাণাডে নিজের হাতে ধরিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার তদানীন্তন লোকনায়কগণের মধ্যে একজনও এরূপভাবে সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ধনী ও পদস্থ লোকেরা আজ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া কোনো স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে সাহস পান না। কিন্তু ইঁহাদের জ্যেষ্ঠেরা একদিন রাজদ্বারে-লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, তাঁহা হইতে দূরে থাকিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত রাজপ্রসাদলোলুপ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করিতেও শঙ্কিত হইতেন। আজ সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজরাজপুরুষদিগের দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তিনি এই রাজকর্ম্মচারী সম্প্রদায় নিকট লাঞ্ছিত হইয়া রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আর বহুদিন পর্য্যন্ত সে লাঞ্ছনার কথা এ দেশের ইংরেজরাজপুরুষেরা বিস্মৃত হন নাই। প্রত্যুত যতই সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই শক্তি সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, ততই তাঁহারা সেই প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতিকে প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও সকলেই জানেন। সেই রাজপুরুষেরাই, আজিকার অবস্থাধীনে, আপদ-বিপদে, প্রতিপদেই দেশের প্রজামতের পোষকতা-লাভের লোভে, সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে কন্‌গ্রেসের কাজকর্ম্ম আজ সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে না; একদিন, কন্‌গ্রেসের

জন্মকালে, তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে প্রাণপণে সেই সুরেন্দ্রনাথকে তাহার বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এ কথাও মিথ্যা নয়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে কন্‌গ্রেসের কর্ম্মে আমন্ত্রণ করিতে চান নাই। হিউম সাহেবও প্রথমে তাঁহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। হিউম ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যে অশ্রদ্ধা বহুদিন হইতেই জাগিয়াছিল, হিউমের মনেও যে তাহা ছিল না, এমন নহে। তার উপরে যখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতি কন্‌গ্রেসী নেতৃবর্গ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হিউম যে সেই মতে সায় দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হিউম যখন কলিকাতায় আসিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া বাংলা দেশের লোকমতকে কন্‌গ্রেসে টানিয়া আনা যে একান্তই অসম্ভব, ইহা দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন তাঁর মত ফিরিয়া গেল এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথকে কন্‌গ্রেসের কর্ম্ম-নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। আজ সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহায়-সম্পদ লাভ হইয়াছে। আজ তিনি দেশের রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাঁহাকে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়, "শোথের শেয়ালার" মত, দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মস্রোতের ঘাটে ঘাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আর আজ তিনি আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে অনন্যপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোনো প্রকারের অনুকূল ঘটনাপাতের ফল নহে। এ কীর্ত্তি অর্জ্জনে কেহ তাঁহাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবেই তাঁর

স্বোপার্জ্জিত। কেবল আপনার প্রতিভা ও পুরুষকারের বলেই সুরেন্দ্রনাথ এ দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনে এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্ব-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র

অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁর এই কর্ম্মজীবন যে এমন অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ মানসিক বলেরই প্রমাণ প্রদান করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বীর পুরুষ নহেন। আমরা সচরাচর যাহাকে বীরত্ব বলি, তার অন্তরালে অনেক সময় একটা ফলাফল-বিচার-বিরহিত একগুয়ামো লুকাইয়া থাকে। এই প্রকারের একগুয়ামো সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; থাকিলে, সুরেন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। সুরেন্দ্রনাথ যে খুব সাহসী পুরুষ, এমনো বলা যায় না। যে অসমসাহসিকতা অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, পরিণামে নিঃশেষ নিষ্ফলতা মাত্র লাভ করে, সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো সেরূপ অসমসাহসিকতা দেখা যায় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দা-স্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভিষ্টসিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, সে বীরত্ব ও সে সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। যে মনের বল থাকিলে লোকে বিরোধী শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু কখনোই তাহার নিকটে নত হয় না;—এই আত্মঘাতী মানসিক বল সুরেন্দ্রনাথের কখনো ছিল না। কিন্তু যে মনের বল আপনার

রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও শ্রম-ক্লেশ, এ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া, সকল অবস্থাতেই, সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ধি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আপনার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে পারে, সুরেন্দ্রনাথের সে মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয়-নায়কের মধ্যে তাহা নাই। যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী, আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থতালাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটী লাভ করিয়াছেন। এই কৌশলটী যে জীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করিতে পারে। এই কুশলতাগুণেই সুরেন্দ্রনাথও জীবন-সংগ্রামের জয়টীকা ললাটে ধারণ করিয়া, ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের রজঃপ্রাধান্য

সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতি যে খুব সাত্ত্বিক তাহা নয়। নির্ম্মলত্ব, ভাস্বরত্ব ও অনাময়ত্ব, এ সকলই সত্ত্বের লক্ষণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় বস্তুধারণায় তৎপর হয়; চিত্ত বিকারশূন্য ও কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। এ সকলের কোনো লক্ষণই এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চরিত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা, যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফলে, বহুদিন হইতেই সত্ত্বপ্রধান হইয়া আছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে কালে কর্ম্মবশে এই সমাজের পুরাভ্যস্ত সাত্ত্বিকতাও ঘোর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্রই যুগসন্ধিকালে এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য যে শিক্ষা ও সাধনায় এই

সাত্ত্বিকীভাব ফুটিয়া উঠে, সুরেন্দ্রনাথ সে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, নূতন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, স্বদেশের সনাতন ভাব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি একেবারেই লোপ পাইতেছিল। সমগ্র দেশই তখন ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশূন্য বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণেই নিযুক্ত ছিল। তার ভিতরতার সত্যের ও মহত্ত্বের অনুভূতি, সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে ক্বচিৎ থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। তার উপরে, সুরেন্দ্রনাথের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাজসিক আদর্শের দ্বারা একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বল্পবিস্তর এই দশা ঘটিয়াছিল। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে কেবল ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইংরেজের চালচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ করিবার জন্য, তিনি অতি অল্প বয়সেই সুরেন্দ্রনাথকে ডভ্‌টন স্কুলে প্রেরণ করেন। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাতার ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান্ বালকগণের সংসর্গে থাকিয়া স্কুল কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তার পরে, বিলাতে যাইয়া এই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করিয়া সিভিলিয়ানী-পদ লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। আজিকালি বিলাত ও ভারত যেন এ'ঘর ও'ঘর হইয়া পড়িয়াছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়া বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ ছিল না। সেকালে বিলাত যাওয়া এত সহজ ছিল না বলিয়া, বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুদিগের নিজেদের প্রাণে একটা প্রবল অহঙ্কার এবং কোনো কোনো দিক্ দিয়া সমাজেও তাঁহাদের একটা অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা ছিল।

সে কালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, তাঁহাদের প্রাচীন পৈতৃক সমাজের কোনো প্রকারের যোগাযোগ প্রায়ই থাকিত না। সমাজও তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিত। আর তাঁহারা নিজেরাও সাহেব সাজিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া মেম সাজাইয়া, "নেটিভ্‌দের" সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মেশামেশি করিলে কি জানি এই সগুলব্ধ সভ্যতার মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে আপনাদের সমাজ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে তাহাই করিয়াছিলেন। আর বিধাতার চক্রান্তে ও তাঁর স্বদেশের সুকৃতি বলে, সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ানী-পদ যদি খসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে আজি পর্য্যন্তও তিনি এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝাই বহন করিয়া চলিতেন। অতএব এই সকল ঘটনাবশে সুরেন্দ্র-নাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনার নিগূঢ় প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের টান্‌টা পুরাদমেই স্বদেশাভিমুখী হইলেও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, এমন বলা যায় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিকী প্রকৃতিই আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন আদর্শ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের কোনও না কোনও একটা গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবে সাত্ত্বিক, বা রাজসিক, বা তামসিক করিয়া তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। কোনও জাতি বা এই জন্য তামসিক, আর কেহ বা রাজসিক, আর কেহ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান, আর কাহারও বা তমোপ্রধান, আর কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা বা সত্ত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনা

রজঃ-প্রধান। ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সত্ত্ব-প্রধান। য়ুরোপের সাধনাতেও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রজঃ-প্রধান বলিয়া য়ুরোপীয় সাধনায় তামসিকতা নাই, বা সাত্ত্বিকতা ফুটে নাই, এমন নহে। জীব সাধন-বলে কথনও কথনও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ মুক্তলোক সর্ব্বত্রই অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সর্ব্বদাই এই গুণত্রয় বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধনায় এবং সভ্যতায়ও সর্ব্বদাই এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাজসিক লোক আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক এবং তামসিক উভয় প্রকৃতিরই যথাযোগ্য অনুশীলনেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ভারতের সভ্যতার ও সাধনার ঝোঁক সাত্ত্বিকতারই দিকে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্রই আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। য়ুরোপীয় সাধনার ঝোঁক রাজসিকতারই দিকে। এই জন্য রাজসিক চরিত্রই সে দেশের আদর্শ চরিত্র। স্থরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ঐকান্তিক প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়াছেন বলিয়া, এই য়ুরোপীয় আদর্শের রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন।

আর স্থরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ সাত্ত্বিক নয়, কিন্তু একান্তই রাজসিক, ইহা কোনোই নিন্দার কথাও নহে। ফলতঃ প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অন্য দেশের তো কথাই নাই, আমাদিগের এই সত্ত্ব-প্রধান সভ্যতা এবং সাধনাতেও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্র যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে যাহাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহা কেবল ঘোরতর তামসিকতারই রূপান্তর মাত্র। সত্ত্ব এবং তমঃ উভয়েরই কতকগুলি বাহিরের লক্ষণ এক প্রকারের বলিয়া অতি সহজেই এইরূপ ভ্রম হইয়া

থাকে। সাত্বিকতার বৃদ্ধিতে অনেক লোকের মধ্যে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারের বাহিরের কর্ম্মচেষ্টা হইতে বিরত করে। এই কর্ম্মচেষ্টাহীনতা তমো-গুণেরও লক্ষণ। তবে এই সাত্বিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে ভগবন্নির্ভর আর তামসিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়গুণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ দু'য়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে অনেক সময় এই নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়ধর্ম্মসম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকেই সাত্বিকতার লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করে। প্রত্যেক যুগসন্ধিকালে পূর্ব্বতন যুগের বিধি-ব্যবস্থা ও রীতি নীতি যখন লোকের একান্ত অভ্যস্ত হইয়া তমোধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তখন, সত্ব-প্রধান সমাজেও, এই জাল সাত্বিকতার প্রভাব অত্যন্তই বাড়িয়া উঠে। এই জাল সাত্বিকতাতেই আমাদের দেশটা এখন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় লোক-সমাজে পুনরায় সত্য সাত্বিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে,জনগণের অন্তরস্থিত রজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক হয়। সুরেন্দ্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা আপনার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এই যুগপ্রয়োজন সাধন করিয়াই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ যখন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদি তিনি লোকচক্ষে কোনো উচ্চ সাত্বিকী আদর্শ ধরিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশব্যাপী তামসিকতারই প্রভাব বাড়িয়া যাইত, প্রকৃত সাত্বিকতা লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। দেশের কল্যাণের জন্য সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই অন্তঃপ্রয়োজনের অনুরোধে সে সময়ে সর্ব্ব প্রকারের লোকহিতব্রতই বিশেষ ভাবে রজোধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্ম্মজীবনে শক্তিসঞ্চার করিবার

জন্য বিধাতা তাঁহাকে ডাকেন নাই। সামাজিক, এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই ভগবান তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মসংস্কারকগণও তখন দেশের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে একটা প্রবল রাজসিক ভাবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন এবং তাহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। অতএব কালধর্ম্মবশেই স্নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র রাজসিক হইয়াছে। এরূপ না হইলে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা কখনই করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা এই সকলই রাজসিকতার প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহা উত্তরোত্তর আরও অধিক পরিমাণে লাভ হউক, এই যে অভিলাষ তাহারই নাম লোভ। পরদ্রব্যাদিতে যে লালসা তাহাকেও লোভ বলে বটে, কিন্তু সে লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, অতি নিম্ন অধিকারের ধর্ম্মও এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। এই লোভ রাজসিক বস্তু নহে। কিন্তু ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে উত্তরোত্তর ধনমানাদি বৃদ্ধি করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ। নিয়ত কর্ম্ম করিবার যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। কোনো বিষয় বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যম, তাহাই আরম্ভ। ইহা করিয়া, পরে উহা করিব, এইরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মিকা যে বুদ্ধি,তাহাই অশম। সর্ব্বপ্রকারের সামান্য বস্তুতে যে তৃষ্ণা তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই রজোলক্ষণ বলিয়াছেন। স্নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকলের দ্বারাই তাঁর প্রকৃতির রজোপ্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এই রাজসিকতাই স্নরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একদিকে বলের ও অন্যদিকে দুর্ব্বলতার হেতু হইয়া আছে। তাঁর ভাল ও মন্দ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উভয়ই এই রাজসিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আপনার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই সুরেন্দ্রনাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত হন, সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। ধন-মানের আশা করিয়াই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সহসা ধন-মান-পদ সকল হারাইয়া, নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যাহা কিছু পৈতৃকসম্পত্তি ছিল, তাঁহার পদচ্যুতির আদেশের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে যাইয়া, তাহাও একরূপ নিঃশেষ হইয়া গেল। পৈতৃক ভদ্রাসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া, দারিদ্র্যের বিভীষিকা মাথায় লইয়া, সুরেন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজকর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করিবেন ভাবিয়া, তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কোনো প্রকারের ব্যবসায়িক-বিদ্যালাভ করেন নাই। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া অন্যত্র তাঁহার বিদ্যার ও যোগ্যতার উপযুক্ত কর্ম্ম লাভ করাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই দমিয়া গেলেন না। আপনার পুরুষকারের প্রভাবে সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া নূতন ক্ষেত্রে নূতন কর্ম্মজীবন গড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন সামান্য বেতনে মেট্রোপলিটন কালেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেক লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে শক্তি ও উদ্যম আবশ্যক, অনেক লোকেই তাহা আর সংগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়া কাহাকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ ইহা একেবারেই জানেন না। জীবন-সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ সময় সময় হটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন নাই। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের রাজসিকতারই ফল।

জীবের জীবনী-শক্তি একদিকে ব্যাঘাত পাইলে যেমন আর একদিকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুরেন্দ্রনাথের বলবতী কর্ম্মস্পৃহাও এই রূপে যখনই একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্ব্ব কুশলতা সহকারে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাতেই যেন, অজ্ঞাতসারে নূতন পথে যাইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় সুরেন্দ্রনাথ প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে আশা যখন অকালে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, তখন তিনি স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে আপনার শরীর মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের যোগসিদ্ধি

সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কথনো ধর্ম্মজীবনের কোনো প্রকারের বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বর মানেন; কিন্তু স্বার্থক বা নিরর্থক ঈশ্বর-প্রসঙ্গে কথনো কালাতিপাত করেন বলিয়া শুনা যায় নাই। স্বদেশের বা বিদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের বা তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে তাঁহার যে কোনো প্রকারের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলেই হউক, আর অহেতুকী ভাগবতী-কৃপাগুণেই হউক, সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ রাগদ্বেষবিমুক্ত বৈরাগী পুরুষ নহেন। পুত্রদারগৃহাদিতে তাঁর আসক্তি নাই এবং এ সকলের ইষ্টানিষ্টলাভে তাঁর চিত্ত বিচলিত হয় না, এমনও নহে। প্রত্যুত তাঁর মত প্রীতিশীল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা যায়

না। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আহ্বানে, নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায়, এই সকল স্নেহমমতার আসক্তি তাঁহার চিত্ত হইতে সর্ব্বদাই অনায়াসে ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে নবীন পুত্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্নীবিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টার কোনোই ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা-দিনে সুরেন্দ্রনাথের পুত্র-বিয়োগ হয়। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে সভাস্থলে আসিবার জন্য ডাকিতে যান, তখন সুরেন্দ্রনাথ নিদারুণ পুত্রশোকে অধীর হইয়া, ছিন্নমূল কদলীর ন্যায়, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। কিন্তু ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার জন্য সভাস্থলে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে শুনিয়া, সেই শোকাহত সুরেন্দ্রনাথ তখনই শোকবেগ সংবরণ করিয়া, চক্ষের জল ও অঙ্গের ধূলি মুছিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ধৈর্য্য ও সংযম পূর্ব্বজন্মলব্ধ যোগশক্তির প্রভাবেই প্রাকৃত জনে সম্ভব হয়। আবার বিগত কন্‌গ্রেসের প্রাক্কালে, এই বৃদ্ধ বয়সে, পত্নী-বিয়োগবিধুর সুরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও যে আপনার দৈনন্দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। এই মুক্তভাব সাধনালব্ধ নহে, কিন্তু সহজসিদ্ধ। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র। আর সেই কর্ম্মজীবনে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এই সহজসিদ্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগূঢ় হেতু। এই মুক্তভাব আছে বলিয়াই, সুরেন্দ্রনাথ কখনও অতীতের নিষ্ফলতার স্মৃতিকে ধরিয়া ভূতলে পড়িয়া থাকেন নাই। ইহার জন্যই তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কখনো আত্মহারা হ'ন নাই। আর এই জন্যই সময়ে সময়ে অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের ভাগী হইয়াও, সুরেন্দ্র-নাথ কখনই আপনার অভীষ্ট কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও কোনো দিনই লোক-নিন্দার

হাত এড়াইতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি এতটাই লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, অন্য লোকে সেই অপবাদ মাথায় লইয়া আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে সাহস পাইত কি না সন্দেহ। রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে যে বিদ্যাসাগর তাঁহাকে অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যখন সেই বিদ্যা-সাগরের মেট্রোপলিটন কালেজের প্রতিদ্বন্দ্বী সিটি কালেজে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই মেট্রোপলিটন কালেজের আর একটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, রিপণ কালেজের, প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহার কুযশে বাংলার শিক্ষিত সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র-নাথ নীরবে সেই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়া অল্পদিন মধ্যেই জনসাধা-রণের চিত্তে আপনার পূর্ব্বতন প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার রিপণ কালেজের আইন বিভাগের অবৈধ আচার আচরণ লইয়া, একটা বিষম গোল বাধিয়া উঠে এবং এই কালেজ একে-বারে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। আর যে ভাবে তখন সুরেন্দ্রনাথ এই আসন্ন বিপদ হইতে আপনার কালেজটী রক্ষা করেন, তাহা লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার যে কুযশ রটনা হয়, সেরূপ কুযশকে ঠেলিয়া অন্য কোন লোকনায়ক স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর শোকে সংযম, বিপদে ধৈর্য্য, নিন্দা-অপবাদে উপেক্ষা, প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্ম্মোদ্যম, এ সকলই সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ যোগশক্তির প্রমাণ প্রদান করে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। সুরেন্দ্রনাথের এই সংযম, এই উপেক্ষা ও এই কর্ম্মোদ্যম, এ সকল উচ্চতম রাজসিকতারই লক্ষণ। এ সকলে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পুরুষকারেরই প্রমাণ পরিচয় প্রদান করে।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে পুরুষকার ও দৈব

কিন্তু এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা তখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব্ব বিষয়েরই সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্মজীবনে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা কেবলই তাঁহার অনন্যসাধারণ পুরুষকারের ফল নহে। পুরুষকার আমাদিগের ভিতরকারই কথা। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের দ্বারা আমাদের জীবনের বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থার সৃষ্টি বা যোগাযোগ সাধিত হয় না। এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া থাকেন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ পুরুষকার লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গমুখে না পড়িলে, আর যে সকল আদর্শের প্রেরণায় এবং যে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষে সেই মহাবিপ্লবের সূচনা হয়, তাহার অনুকূলতা না পাইলে, সে অলোকসামান্য পুরুষকার কখনই স্ফূরিত হইত না এবং স্ফূরিত হইলেও কখনই আপনার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভে সমর্থ হইত না। আর যে সকল ঘটনাসম্পাতে ও যে সকল ব্যবস্থা ও অবস্থার যোগাযোগে নেপোলিয়ানের পুরুষকার স্ফূরিত ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বকৃত নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবকৃত। সুরেন্দ্রনাথের পুরুষকারের আত্মপ্রতিষ্ঠাতেও এই দৈবের কার্য্যই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

যে সকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির যোগাযোগে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার আত্মপ্রকাশের অনুকূল এবং সময়োচিত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। এরূপ ক্ষেত্রেও অবসর না পাইলে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন যে অসাধারণ সফলতালাভ করিয়াছে, তাহা কখনই লাভ করিতে পারিত না। ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অতি-

শয় অলোকসামান্য, কিম্বা তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা প্রসার যে খুবই বেশী, তাহা নহে। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁর পূর্ব্বেও অনেক এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন ; তাঁর জীবনকালেও অনেক ছিলেন এবং আছেন। কৃষ্ণদাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি কিম্বা রাজেন্দ্রলালের মত পাণ্ডিত্য সুরেন্দ্রনাথের কখনই ছিল না। এমন কি কোনো কোনো দিক্ দিয়া শিশিরকুমারের প্রতিভাও সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথচ সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, ইঁহাদের কেহই সে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের যে অনুকূল যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের তাঁর সমসাময়িক কিম্বা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনো লোকনায়কগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি অনুসারে সকলেই স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহাঁদের কাহারো নাম থাকিবে কি না সন্দেহ। পণ্ডিতসমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া অনেক দিন রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের এবং শিশিরকুমারের নামও কতকটা থাকিবারই কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এই দুই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম কতকটা থাকিয়া যাইবে। কারণ "হিন্দু-প্যাট্রিয়ট" ও "অমৃত-বাজার"কে উপেক্ষা করিয়া এদেশের আধুনিক সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক ভারতের ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জীবনে ও

চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, কৃষ্ণদাস কিম্বা রাজেন্দ্রলাল কিম্বা শিশিরকুমার হইতে তাহা হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তি ইহার একটা প্রধান কারণ বটে; কিন্তু কেবল এই বাগ্মিতা-প্রভাবেই সুরেন্দ্রনাথ এই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি

সত্য বলিতে কি, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তিও যে অত্যন্ত উচ্চ-অঙ্গের এমন কথাও বলা যায় কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি-বক্তৃতার শব্দ-সম্পদ অতি অদ্ভুত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের বক্তাদের ত কথাই নাই, ইংরেজবাগ্মিগণের বক্তৃতাতেও এরূপ অসাধারণ শব্দসম্পত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুললিত শব্দযোজনায় সুরেন্দ্র-নাথের বাগ্মিতা যে অনন্যসাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছে, চিন্তার গভীর-তায় কিম্বা ভাবের মৌলিকতায় অথবা যুক্তিপরম্পরা-প্রয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা বহুল পরিমাণেই ধ্বন্যাত্মক। সঙ্গীতের শক্তিও এইরূপই ধ্বন্যাত্মক। আর সঙ্গীত যেমন ধ্বন্যাত্মক স্বরগ্রামের দ্বারাই মানবের চিত্তকে বিবিধভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাও সেইরূপ শক্তিশালী শব্দপ্রবাহের বলেই শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িৎ-সঞ্চার করিয়া থাকে। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম যতক্ষণ কর্ণপটাহ আহত করিতে থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্তু সে সুরলয় প্রবাহ যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন তার অশরীরী স্মৃতিমাত্র পড়িয়া থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার ছুঁইবার বড় বেশী কিছুই থাকে না; সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দপ্রবাহও সেইরূপ

ফলই উৎপাদন করে। যতক্ষণ তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণই তার উন্মাদিনী উদ্দীপনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শব্দস্রোতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তার স্মৃতি-মাত্রই জাগিয়া রহে, কিন্তু সে বক্তৃতার চিন্তাযুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও চরিত্রকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সুরেন্দ্রনাথ কেবল আপনার অসাধারণ বাগ্মিতাবলেই যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আর সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এই অদ্ভুত শব্দসম্পদও প্রকৃতপক্ষে সহজসিদ্ধ নয়। যে সকল সাহিত্যিকের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের শব্দবিন্যাসের অন্তরালে সর্ব্বদাই হয় ভাবরাজ্যের কিম্বা জ্ঞানরাজ্যের কিম্বা বাহিরের বিষয়জগতের কিম্বা সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটা অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে। এই বস্তুতন্ত্রতা হইতেই সহজসিদ্ধ সাহিত্যিকের শব্দশক্তি উৎপন্ন হয়। যে সকল লেখক ও বক্তার শব্দ-সম্পদ্ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের রচনা বা বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক উদ্দীপনাতেই পর্য্যবসিত হয় না; কিন্তু পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানে ও জীবনে সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যাঁহাদের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ নয় কিন্তু কঠোর সাধনালব্ধ, তাঁহাদের সাহিত্যচেষ্টা অনেকসময় বস্তুতন্ত্রতা-হীন হইয়া এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদ্ও সাধন-লব্ধ। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি অসাধারণ। এই স্মৃতিবলে অনেক শব্দসম্পদ্শালী ইংরেজ-লেখকের গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। এই সকল ইংরেজ-লেখকের শব্দসম্পদ আয়ত্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা এমন সম্পত্তিশালী হইয়াছে। আর পরধনপুষ্ট বলিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মি-

তার শব্দশক্তির পশ্চাতে সর্ব্বদা কোনও সজীব বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে না এবং এই কারণেই তাহার উদ্দীপনাও স্থায়ী হয় না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও প্রধানতঃ আপনার বাগ্মিতাবলেই সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্ম্মজীবনে যে স্থায়ী প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুরুষকারই ইহার একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তরালে দৈবপ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়।

দেশকালের যথাযোগ্য যোগাযোগ ব্যতীত এ জগতে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক কোনো প্রকারের সাধনাতেই লোকে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আর দৈবকৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে এই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতটা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আজি পর্য্যন্তও তাঁর স্বদেশের প্রাণবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথমে যে তিনি এই প্রাণস্রোতের একান্ত বাহিরে পড়িয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইংরেজিশিক্ষিত স্বদেশবাসিগণের সকলেরই এই অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথাবার্ত্তা ও পত্র ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিন্তা করিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি অবলম্বনেই নিজেদের ভাবাঙ্গসাধনের চেষ্টা করিতেন। ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজকে এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুযায়ী আপনাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ইঁহারা সকলেই স্বল্পবিস্তর লালায়িত ছিলেন। এই অবস্থায় যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি-শব্দ-সম্পদ-পুষ্ট, ইংরেজি-অলঙ্কার-ভূষিত, ইংরেজি ভাবে অনুপ্রাণিত, য়ুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত বাগ্মিতা তাঁহার স্বদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ইহাই কিছুই বিচিত্র নহে।

ইংরেজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্তা ও ব্যক্তিত্বাভিমান

ইংরেজিশিক্ষা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা এই ব্যক্তিত্বাভিমানকেই সত্য স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, প্রাচীন যুগের য়ুরোপীয় সাধনায় এই ব্যক্তিত্ববোধ—ইংরেজিতে যাহাকে sense of personality বলে—ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে অঙ্গীরূপে এবং সেই সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অঙ্গরূপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে ছাড়িয়া যেমন অঙ্গের কোনই সার্থকতা নাই ও থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ সমাজকে ছাড়িয়াও সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সার্থকতা যে আছে বা থাকিতে পারে, গ্রীসীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং গ্রীসে যে সকল ব্যক্তি সমাজ-জীবনের পরিপুষ্টিসাধনে একান্ত অসমর্থ হইত, তাহাদিগের বাঁচিয়া থাকারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমাজের ঐকান্তিক আনুগত্যই সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন গ্রীসে সেইরূপ প্রাচীন ইহুদায়ও কোনো প্রকারের ব্যক্তিত্ববোধ জাগিতে পায় নাই। ইহুদীয় সাধনা জনসমাজের সমষ্টিগত সার্থকতাই উপলব্ধি করিয়াছিল। ব্যষ্টিভাবে সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরও যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে, এই জ্ঞান ইহুদীয় চিন্তাতে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনা এক দিকে ইহুদীয় এবং অন্যদিকে গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহার-তত্ত্বের প্রভাবে এই নূতন খৃষ্টীয় সাধনায় কিয়ৎ-পরিমাণে পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারসম্বন্ধে একটা ব্যক্তিত্ববোধ জাগিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহুদীয় সমাজতন্ত্র এবং গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্রতন্ত্রের

স্থানে নূতন খৃষ্টীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিত্বাভিমানকে এখানেও চাপিয়া রাখিতে লাগিল। ইহুদায় ও গ্রীসে যেমন সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একান্তভাবেই সমাজশক্তির ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন করিয়া রাখিয়াছিল, প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনাও সেইরূপই খৃষ্টীয়ান জনসাধারণকে একান্তভাবেই Churchএর বা খৃষ্টীয় সঙ্ঘের অধীন করিয়া রাখে। প্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হইল মাত্র, কিন্তু জনমণ্ডলীর ঐকান্তিক পরাধীনতার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। এইরূপে যেমন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক তন্ত্রে, সেইরূপ নূতন খৃষ্টীয় তন্ত্রেও জনগণের ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বহু শতাব্দ ব্যাপিয়া একদিকে পৌরহিত্য-প্রধান রোমক খৃষ্টীয় সঙ্ঘ ও অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী প্রজারঞ্জনবিমুখ খৃষ্টীয়ান ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়া য়ুরোপীয় জনমণ্ডলীর অন্তর্বাহ্য সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীন চেষ্টাকে একান্তভাবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রাণগত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নির্জীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রামাণ্যবিচারে স্বাভিমতের এবং রাষ্ট্রীয়-শাসন-ব্যাপারে লোকমতের কোনই অধিকার ও মর্য্যাদা ছিল না। রোমক সঙ্ঘের প্রধান পুরোহিত বা পোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্ম্মজীবনে আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান রাজন্যবর্গও জনগণের সাংসারিক কর্ম্মজীবনে ঐশ্বরিক মর্য্যাদার দাবী করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক পৌরহিত্যের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া মার্টিন লুথার খৃষ্টীয় জগতে ধর্ম্মের প্রামাণ্যবিচারে জনগণের স্বাভিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই খৃষ্টীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তার বা Free Thoughtএর উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে। মার্টিন লুথার রোমক সঙ্ঘের অধিপতি পোপের অতিপ্রাকৃত

প্রভুত্বের দাবীই অগ্রাহ্য করেন ; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের অতি-প্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান্ সাধক ও যজমানকে, ভগবৎ প্রেরণাধীন হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের যথাযথ মর্ম্মনির্দ্ধারণের অধিকার প্রদান করেন। রোমক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের মর্ম্মনির্দ্ধারণের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টীয় সাধক ও সাধনার্থী জনমণ্ডলীর স্বাভিমতের কোনোই স্থান ছিল না। মার্টিন লুথার যে সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহাতে শাস্ত্র ও স্বাভিমতেরই প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সদ্‌গুরুর কোনো স্থান হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই প্রাচীন কালের ধর্ম্মজীবন ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার বলে তাহার অনুরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। সর্ব্বপ্রকারের গভীর আধ্যাত্মিক-অভিজ্ঞতাবিহীন প্রাকৃত জনের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির কিম্বা লৌকিক ন্যায়ের যুক্তির বলে অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা একান্তই অসম্ভব। সে অদ্ভুত চেষ্টা সর্ব্বদাই বন্ধ্যার পুত্রশোকের ব্যথার ন্যায় কল্পিত ও অলীক হইবেই হইবে। কেবল সন্তানবতী রমণীই যেমন আপনার অন্তরের বাৎসল্য-রসের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরের মাতৃ-স্নেহের প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন ; সেইরূপ অনন্য-সাধারণ সাধন-সম্পদ-সম্পন্ন সদ্‌গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পুরাতন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন। প্রত্যেক বিদ্যার শাস্ত্রই, বহুকালব্যাপীসাধনা দ্বারা যাঁহারা সেই বিদ্যাকে প্রকৃতভাবে অধিগত করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাপক ও

আচার্য্যগণের শিক্ষার সত্যাসত্যের সাক্ষ্য দেয়; আর এই সকল অধ্যাপক এবং আচার্য্যগণও নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে আপনাদের বিদ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে সদ্‌গুরুর প্রামাণ্য ও প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অথচ মার্টিন লুথার-প্রবর্ত্তিত Protestant খৃষ্টীয় সাধনা ধর্ম্মসাধনে যেমন শাস্ত্রের ও স্বাভিমতের সেইরূপ সদ্‌গুরুরও যে একটা সঙ্গত স্থান ও অধিকার আছে, ইহা অস্বীকার করে। ইহার ফলে প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মনির্দ্ধারণে প্রাকৃত জনের অসংস্কৃত বিচারবুদ্ধি এবং লৌকিক ন্যায়ের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই প্রমাণদ্বয়ই একমাত্র কষ্টিপাথর হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারের প্রাবল্য হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্যমর্য্যাদাটুকুও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়! এই রূপেই য়ুরোপে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর স্বাধীনচিন্তার বা Free Thought এর এবং যুক্তিবাদের বা Rationalismএর প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিবাদ প্রবল হইয়াই য়ুরোপীয় লোকচরিত্রে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইয়া তুলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানই ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গ-মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে। আমার বুদ্ধি যাহা সত্য বলে তাহাই কেবল সত্য, সত্যের আর কোনো বাহিরের প্রামাণ্য নাই, আমার সংজ্ঞান বা Conscience যাহাকে ভাল বলে তাহাই ভাল,—ইহার উপরে ভালমন্দের আর কোনো উচ্চতর বিচারক নাই—এই বস্তুকেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা স্বাধীন চিন্তার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবেই য়ুরোপে স্বাধীনতার নামে একটা অসঙ্গত ও অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে ক্রমে সমাজের গ্রন্থি শিথিল, ধর্ম্মের

প্রভাব ম্লান এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক ভারতে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার

ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও এই য়ুরোপীয় স্বাধীনচিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের প্রাণে স্বাধীনতার নামে একটা অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সূত্রপাত করে। এই ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-চেষ্টার বহুবিধ ভ্রম-ক্রটী এবং অসম্পূর্ণতা-সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনগঠনের জন্য তাহা যে একান্তই প্রয়োজন ছিল, কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত না হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধনা করিতে পারে না। এই সংস্কারবর্জ্জনের নামই চিত্তশুদ্ধি। কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়েরই আত্মচরিতার্থতালাভের জন্য এই চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক হয়। 'নেতি'র ভিতর দিয়াই 'ইতি'তে যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থার পরেই অন্বয়ী পন্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই আমাদিগের প্রাচীন বেদান্তের শিক্ষা। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল, Through Eternal Nay to Eternal Yea, এই সূত্রে অমাদের এই প্রাচীন উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সমাজের সকল অযৌক্তিক বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, ধর্ম্মের শাস্ত্রবদ্ধ সকল অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও সংজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে যাইয়া, আমাদিগের দেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় এই নেতি বা "না"-এর পথ ধরিয়াই, নিজেদের ও সমাজের চিত্তশুদ্ধিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যেরূপ আগ্রহ সহকারে যতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার

করিয়া এই নূতন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনো প্রদেশের লোকে সেরূপ করেন নাই। আর এই সাধন-বলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ বাংলা দেশে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে ভারতের আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্য্যার আদর্শ

ফলতঃ যে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসিগণ বহুল পরিমাণে এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙ্গালী তখনও এই মুক্তি-মন্ত্রসাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার ধর্ম্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা, এ সকল এ পর্য্যন্ত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা একদিকে নূতনকেও নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্যদিকে পুরাতনের সনাতন প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেও সজীব ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু নূতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের মধ্যে একটা খিচূড়ী পাকাইবারই চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-সংস্কারচেষ্টাতেও অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতি-দোষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া বাংলা আপ-নার বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের

পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে ন্যায়ের প্রেরণা অপেক্ষা সুখের প্রলোভনই বলবত্তর হইয়া আছে। সত্যের আনুগত্য অপেক্ষা সুবিধার অন্বেষণই তাহাতে বেশী। অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ চিরদিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেই রূপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার অদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্য প্রদেশের স্বাদেশি-কতাও একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও প্রতি-ষ্ঠিত হয় নাই, আর অন্যদিকে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব-হিতৈষা ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ, অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীলতার, আর কোথাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশূন্য প্রেয়-সন্ধিৎষু বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া আছে। অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথোপযোগ্যসঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে ইদানীন্তন কালে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসিগণ এ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

পরযুগের যুগ-আদর্শ ও রাজা রামমোহন

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, আধুনিক ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন। ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজের শাসনে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যক্‌রূপে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া, কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, ইহা দেখাইয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজজীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, নানা দিক্ দিয়া, ঋজু কুটিলভাবে, বিগত শত বৎসর ধরিয়া, দেশের শ্রেষ্ঠজনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দব্যাপী সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হয় নাই।

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ যোগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়াও আপনার কর্ম্মজীবনে বিশেষভাবে তার তত্ত্বাঙ্গ বা theoretic sideই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন যুগের সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় ও তাহার প্রাণ-হীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্ম্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমুদায় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা সমাজজীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছেন সত্য। একদিকে যেমন ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোভিত ও সুসংস্কৃত করিয়া, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বনেই তাহাকে সত্যোপেত ও সময়োপযোগী

করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজজীবনেও যে সকল অহিতাচার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কারসাধনে সময়োচিত যত্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। আর দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও যাহাতে প্রজাসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজা রামমোহন সে দিকেও যথাযোগ্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের এই ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতা সত্ত্বেও রামমোহন বিশেষভাবে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোনও একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে কোনও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহাকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য রাজা রামমোহন নবযুগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাঁহার কর্ম্মের ঝোঁক সে ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রাজার স্বাধীনতার আদর্শ

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন

করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ব্ববিধ অনাত্ম-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে, অহং প্রত্যয় বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ মোক্ষসম্পর্ক ছিল। আর এই মোক্ষ-সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। রাজার দেশ-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। অন্যদিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামানুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একটা অপূর্ব্ব সঙ্গতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ন্যায়, রামমোহন কি তত্ত্ববিচারে কি ধর্ম্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎ-পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্দ্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় রাজা শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইজন্যই প্রোটেষ্ট্যান্ট সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private Judg-

mentএর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্‌গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এই-রূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজার সামাজিক সিদ্ধি

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্ত্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে জগতের সর্ব্বত্রই সমাজের কর্ম্ম-বিভাগ বংশ-মর্য্যাদার অনুসরণ করিয়া চলে। যে যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম ও অধিকারই সমাজ-জীবনে তার নিজেরও কর্ম্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বাল্যশিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে জীবিকা উপার্জ্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্ম্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম্ম ও অধিকার-ভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিতও

ছিল। সমাজবিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়াই যে অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই আশ্রমধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দু সাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাবসুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতিসুলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্য্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্ম্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্যই গীতায় ভগবান্ প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে, গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন ঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

অতএব বর্ণাশ্রমপ্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্ব্বকর্ম্মন্যাসপূর্ব্বক, মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই

আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্ম্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই, সমাজ-জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন,—এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্ম্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানী নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোক সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম-বিরহিত সুতরাং ধর্ম্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থে, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই, লোক-শ্রেয়কে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্ম্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে কিম্বা সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটাই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব, তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহার সর্ব্ববিধ পূর্ব্ব-সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্য্যের পূর্ব্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগ-সন্ধি কালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, কোন্ সূত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্যক্ দৃষ্টি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই, নূতনকেও আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন এবং নূতনের অভিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন-প্রতিভাসুলভ সম্যক্ দর্শন থাকে না। থাকিলে, তাঁহারা যে বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্য্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক্ দর্শন সচরাচর সংস্কার-কার্য্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়া

দিয়া তাহাদিগের কর্ম্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্যই সংস্কারকের পক্ষে কর্ম্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক্-দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশদর্শিতা বেগবতী সংস্কারচেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্ত্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে, স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য, সদ্‌গুরুর মর্য্যাদা, সমাজবিধানের ধর্ম্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জ্জিত ও নির্ম্মল হইতে পারে না। এই সর্ব্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বশূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই "নেতি"র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ

নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Independence বা অনধীনতা বলে তারই পথ; সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া একপ্রকারের ফ্রিডমে (Freedom) পৌছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rightsএর পথ, স্বত্বের পথ; Reconciliationএর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা;—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্ম্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার-প্রয়াস সর্ব্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত Rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আধুনিকযুগে কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড্ হেয়ার এবং ডি, রোজেরিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Independenceএর আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে আপনার কর্ম্মজীবনে এই দুই সংস্কার-স্রোতকে একীভূত

করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্য দিকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনের বিচ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতেছিল, কেশবচন্দ্র সেই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, এই সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিম্বা সংজ্ঞানের (Conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন পরিচালনায় শাস্ত্র-গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্ম্ম সাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটাই করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবন

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের সূচনার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধিই

বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতার সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বে-সরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া,সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন বা-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব্বেই কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, সে'কালের বাংলার মনীষীবর্গ সকলেই, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্-এসোসিয়েশন্‌ভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইঁহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাবঅভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহাদিগকেই জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা Natural Leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভা সর্ব্বদা জমীদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থরক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমীদার-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমীদারী স্বত্বস্বার্থের পরিপোষক এবং জমীদার-সমাজের মুখপাত্র-রূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভা জমীদারদিগের সভা হইলেও প্রয়োজনমত আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার

অলোচনায় জনসাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভার নেতৃবর্গ জমীদারী স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগে, রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

আধুনিক স্বদেশাভিমান ও স্বাদেশিকতা

ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্ম্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাতেই আবার তাঁহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার হয়। আমাদের সে'কালের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা বহুলপরিমাণে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল সত্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমানও জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজে-দের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর এই হীনতাবোধ সর্ব্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে

অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই, আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্টা যদি সর্ব্বতো-ভাবে খৃষ্টীয়ানী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিস্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism, আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমা-দিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতাগ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্য-প্রতিভা-রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ ভ্রম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া, খৃষ্টীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোনো পথ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া, যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে নিজেদের ধর্ম্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই,—যে স্বদেশের ধর্ম্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এ জগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্য প্রেমকে ফোটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার-

অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানব-প্রকৃতির এই নিয়মবশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত ধর্ম্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাঁহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্ম্মের ভ্রমপ্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার জগতের অপরাপর ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, ইঁহারা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয় প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্ম্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ-প্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পর-জাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের"

প্রতিষ্ঠা করেন। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনোমোহন, প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নানা দিকে ও নানা ভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"; সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়, হোক্ ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়"; গোবিন্দচন্দ্রের "কতকাল পরে, বল ভারতরে" এবং প্রাচীন স্মৃতিবাহিনী "যমুনা লহরী"; মনোমোহনের "দিনের দিন সবে দীন";—এই সময়েই এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথের "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নীলদর্পণের মর্ম্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। "ভারত মাতা" প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্য্যার পুরোহিতরূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ-যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই, তাঁহার কর্ম্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার শিক্ষা

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্ব্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, উদ্যমশীল যুবকমণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবসুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমেই কোনো প্রকারের বস্তুতন্ত্রতাও লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই। বিশেষতঃ দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার-আলোচনা কখনই প্রকাশ্যভাবে বঙ্গদর্শনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। "কমলাকান্তের দপ্তরে" লেখকের অসাধারণ শ্লেষালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শেরই গভীর আলোচনা রহিয়াছে, সত্য; কিন্তু অতি অল্প লোকেই সে সময়ে "কমলাকান্তের" সুমধুর বিদ্রূপাত্মক সুরসিকতার নিগূঢ় মর্ম্ম-উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্যশিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যরসটুকুই আস্বাদন করিতেন, লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং অসাধারণ

শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এ সকল ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব লুকাইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভ করেন নাই। এই সকল কারণে, বঙ্গদর্শন নানাদিক্ দিয়া আমাদিগের নবজাত স্বাদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও, বিশেষভাবে ইহাকে বস্তু তন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব এবং উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল না বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে য়ুরোপেও ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণই বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার আত্মচরিতার্থতা-লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস যে পরবর্ত্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্ম্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, এ সকল কথা সে কালের য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমরা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলকলেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিম্বা কর্ম্মের উদ্দীপনা আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণেই যদিও ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের—আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন গ্রীস্, রোম ও মধ্যযুগের য়ুরোপখণ্ডের—ইতিহাসও পাঠ করিতাম, কিন্তু এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের সজীব

স্বদেশ-প্রেমের কিম্বা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের একযোগে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছাত্র-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সভাই তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। যে অলোকসামান্য বাগ্মিতা-শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্রসভাতেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে স্ফূরিত হয়। এই ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ "শিখ-শক্তির অভ্যুদয়"—The Rise of the Shikh Power,—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন —তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কথনই লুপ্ত হইবে না। শিখধর্ম্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে, শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্ব্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িতসঞ্চারিণী বাগ্মীপ্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি

আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্য্যাদাজ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনো গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত বিশ্বাস একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ-প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি ভারতে যে মহা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উন্নত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্য পক্ষে বাবা নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্ম্মবাহুল্য ছিল না, অন্য দিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের পিউরিট্যান (Puritan) সাধারণ-তন্ত্রের বা Commonwealthএর অনুরূপ ছিল। আর এই জন্যই আমাদের ইংরেজিশিক্ষা য়ুরোপীয় সাধনায় অভিভূতচিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার অনেক পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা বাংলা সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, সত্য; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে একান্তই "পৌরাণিকী" কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ

ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্ত্তিকাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মচেষ্টা, য়ুন-ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-জীবনের ব্যাপকতা

এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশ-প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-জীবনের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমাবধি সমগ্র ভারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব

হইতেই আমাদিগের স্বদেশপ্রীতির এই অপূর্ব্ব উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই আধুনিক স্বাদেশিকতা এ পর্য্যন্ত বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব, এই তিন প্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলার স্বাদেশিকতার আদর্শ যতটা উদার ও উন্নত, মহারাষ্ট্রের কিম্বা পাঞ্জাবের স্বাদেশিকতার আদর্শ ততটা উদার ও উন্নত নহে। ইংরেজ এদেশে না আসিলে ভারতরাষ্ট্রে মারাঠা ও শিখ, ইঁহারাই সম্ভবতঃ মোগলের উত্তরাধিকারী হইয়া দেশের শাসন-শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিতেন। ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইলেও তাহার স্মৃতি শিখ বা মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আর এই কারণে পাঞ্জাবের কিম্বা মহারাষ্ট্রের স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়া আছে। বাংলায় সেরূপ কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি নাই বলিয়াই, বাঙালীর স্বাদেশিকতার কোনো প্রাদেশিক আশ্রয়ও নাই। অন্যদিকে বাঙালীর প্রকৃতিও শিখ বা মারাঠার প্রকৃতির মত নহে। শিখ খাল্‌সা ভারতমাতার বাহুতেই বল সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে তাঁহার বাণীশক্তি অধিকার করিতে পারে নাই। অন্যদিকে মারাঠা ও বাঙালী ইহাদের বুদ্ধি-বল ভারতের অপরাপর জাতির বুদ্ধি-বল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও বাঙালীর বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে প্রভেদও বিস্তর। মারাঠার বুদ্ধি কার্য্যকরী, ইংরাজিতে ইহাকে practical বলে। বাঙালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, ইংরাজিতে ইহাকে idealistic বলা যায়। কার্য্যকরী বুদ্ধি ফলসন্ধিৎসু; কর্ম্মাকর্ম্মের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়া চলে। ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসন্ধিৎসু; কর্ম্মাকর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলা-ফলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবরাজ্যে ও তত্ত্বাঙ্গে তাঁহার কি পরিণাম ঘটিবে, তাহাই কেবল দেখে। কার্য্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে চাহে; ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শেতেই

আত্মসমর্পণ করে। দেশচর্য্যায় কার্য্যকরী বুদ্ধির প্রেরণা প্রাদেশিকতাকে বাড়াইয়া তোলে এবং স্বদেশ-ভক্তিকে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচর্য্যা ও দেশভক্তিকে সর্ব্ব প্রকারের প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্ব্বজনীন করিতে চাহে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্য্যকরী বুদ্ধি আসন্নফলসন্ধিৎসু politician এর বা রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী ও সম্যক্‌দর্শী নীতিজ্ঞ বা Statesmanএরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্ম্ম-জীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় মানববুদ্ধির ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর বাঙালীর প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় গৌরবস্মৃতির অভাবে, আমাদিগের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ বাঙালী কর্ম্মনায়ক সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনও সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ লইয়াই বিব্রত এবং প্রাদেশিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদপত্রেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ব-বোধের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত, নতুবা এক প্রদেশের সুখ-দুঃখ অন্য প্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত কি না সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভা, পুনার সার্ব্বজনিক্ সভা ও মান্দ্রাজের মহাজন-সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়, ও উদ্যোগে যে ভারতসভার বা Indian Association এর জন্ম হয়, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া

তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্ম্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারতসভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই উত্তর ভারতের বড় বড় সহরে শাখা সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কাণপুরে, মীরাটে ও লাহোরে শাখা-ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্র-নাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারত-সভা দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহির্ম্মুখীন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত ইহা এখন কল্পনা করাও সুকঠিন।

ফলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারত-সভার কর্ম্মনায়কগণ একটা বিরাট জাতীয়-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানা স্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আর কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীতিক্ লাট ডফ্-রিণেরও যে কতকটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন। বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ভারতসভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয়-সমিতির বা National Conferenceএর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের

সংবাদ রাখিতেন কি না, জানি না। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে দেশের নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইঁহারা সকলেই এই National Conferenceকে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজাশক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস যদি সহসা এই স্থানটী পূর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conference আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তি-কেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী এল্যান্‌ ও হিউম। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর প্রধানতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কংগ্রেস এই রূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ পদ-বল ও ধনবলের উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচেষ্টার অন্তরালে তখন এ দু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত National Conferenceকে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃত পক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে, না লাভ লইয়াছে বলা কঠিন নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কন্‌ফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম্ম-চেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত, তাহা হইলে দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহা যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায়

জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সে গুলির শক্তিহরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্ব্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীর্ত্তি দুটী—এক লাট ক্রসের ১৮৯১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, আর অন্য লাট মর্লের আধুনিক কাউন্সিল্ সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের অনন্যপ্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়া দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া, বহুল পরিমাণে আপনার কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।

কিন্তু ইহাতে যে দেশের কোনো সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে, এমনও বলিতে পারি না। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টা সময়োপযোগী হইয়াছিল মাত্র, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার কিম্বা তাঁহার স্বদেশী লোকপ্রকৃতির অনুযায়ী হয় নাই। সমাজসংস্কারে কেশবচন্দ্র যেমন প্রথম জীবনে বহুল পরিমাণে বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংসা হইবে, তাহার নিগূঢ় সন্ধান ও সঙ্কেত ধরিতে পারেন নাই; সুরেন্দ্রনাথও সেইরূপ ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসনসংস্কার করিতে যাইয়া, শাসক ও শাসিতের

মধ্যে বিরোধই জাগাইয়া তুলেন, কিন্তু কোন্ পথে যাইয়া শাসিতেরা যে প্রকৃত পক্ষে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, আর কোন্ সূত্র ধরিয়াই বা এ দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ সে সন্ধান এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংযত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই সুরেন্দ্রনাথের সুপরিচিত। সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্য মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই। যেটী যেমন আছে বা হইয়াছে, তিনি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ধরিতে পারেন, কিন্তু যে মানসিক শক্তি চারি দিকের বিষয় ও বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কোনো নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারে, সে শক্তি সুরেন্দ্রনাথের নাই। সুতরাং স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশ সাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের ভাষা যে তাঁর স্বদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, ইংরেজের ভাব যে তারা ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের একেবারেই অপরিচিত, ইংরেজের প্রকৃতি যে তাহাদের প্রকৃতি হইতে একান্তই ভিন্ন, এ সকল কথা সুরেন্দ্রনাথ এখনও ভাল করিয়া বুঝেন কি না সন্দেহ। আর স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের লোকপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার এবং আদর্শের কোন জীবন্ত যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় কর্ম্মোদ্যম কেবলমাত্র একটা অসম্বদ্ধ, অনির্দ্দিষ্ট, প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাববোধকেই জাগাইয়াছে; কিন্তু

এখনোও দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো অঙ্গকেই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এইরূপ অভাববোধ হইতে উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু কখনই দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মই তারা বোঝে, ধর্ম্মের নামেই তারা মাতে, ধর্ম্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজি পর্য্যন্ত মোক্ষসম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপরেই যাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জনমণ্ডলীর চিত্তকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জনমণ্ডলীর চিত্তে এক নব শক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরঋণী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহা কোনো কোনো দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের এবং কর্ম্মচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা

অঙ্গীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের অশেষপ্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি যে কাজটী করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটী করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না; আর এই জন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে একটা নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা "লীডার"। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস জমিদার-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার কি কালীচরণ, ইঁহাদের কেহই সেকালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে ইঁহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোনও লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না বলিয়াই, সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার বা নায়কের বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা নেতা বলি সে বস্তু তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোথাও বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা তখন সে বস্তুকে নেতা বা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নাম দান করিতেছি বলিয়াই যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা বলিতে বেশি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথার জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা এমন সহজ ব্যাপারও নহে।

আমরা লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণই কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি, তার পরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখ-পাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথায় আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া আমরা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা আমাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে ক্বচিৎ ধর্ম্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোক-প্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর ভক্তিযোগ বাংলাভাষার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছ্বলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া

উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি, এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন ; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্বলাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন ; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনী-কুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ব-বলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্বলাভ হয়, অশ্বিনী-কুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর এক-জনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোকনায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ (বলিলেও চলে) কবি ; কেহ মসীজীবী, কেহ ব্যবহারজীবী ; কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইঁহারা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইঁহারা দেশের প্রাণতা বাড়া-ইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই, সত্য অর্থে, লোকনায়ক নহেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তক আনন্দ

করিয়া পড়ে, ইঁহাদের বক্তৃতা আগ্রহ করিয়া শোনে, ইঁহাদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে; ইঁহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে ইঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইঁহাদিগকে আদর করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল, সত্যভাবে, ইঁহাদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইঁহাদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যতদিন ইঁহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইঁহাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে, সরাসরিভাবে, ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা-বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা যে ভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁরাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত, অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন,

গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্যলাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথি-সেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য, তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁরা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোক-নেতৃত্ব ছিল। ইঁহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই! লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখা পড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষি-তে'র, 'বিজ্ঞে'র ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁর চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যা-পনা করাইতেন, তখনও গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তাঁর তামাকাদি সাজিয়া, তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাদের সঙ্গে তাঁর বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না। আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত ব্রাহ্মণের

শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে, সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্টি লাগে না, আমাদের কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসব-ব্যসনাদিতেও তারা আমাদের কাছে ঘেষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে;—খাতিরে করে, ভয়ে করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের "মাসমিটিংএ" আসিয়া জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের টানে, প্রাণের দায়ে আমাদের কাছে তারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোকনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভবে না।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজিনবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ

বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে, বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট রিপন্ প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা Local Self-governmentএর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহারজীবিগণ এই স্বায়ত্তশাসনেতেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং জেলার সেবাতে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদূর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক

বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এই বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় অপর সকলেই, এগুলিকে জীবিকাউপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত উপায় রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজি পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনাকার্য্যে কোনও প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তযুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। শিষ্যদিগের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্রগঠনের মূলে পরার্থপরতাসাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতা-

সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহু দিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমান-প্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ আপনার পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মল-মূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সহরের বরাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখনো কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট

হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছুই নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবল মাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি সর্ব্বদা পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিতলাভ না হইলেও তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া সকল মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতেন, পারে

আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্পবিস্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র-সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নরঃশূদ্র-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহে; অথচ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃ-শূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর মুখে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনটা বেশই বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলের আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধিগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করে। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন যে, “বাবুরা ত ‘বন্দে মাতরম্’ বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই; কথাটী মন্দ নয়!” এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার

উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন —"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই, বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা যায়।

সে কালের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন কি এক সময়ে তাঁর যৌবন-বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে বুঝিবা অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ এবং ধর্ম্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও অশ্বিনীকুমার তাহার সমাজ-দ্রোহিতার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্যই দেশে ফিরিয়া, পিতার আদেশে, খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আমি যতদুর জানি মত ও বিশ্বাসে অশ্বিনীকুমার এখনও অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্নই হইয়া আছেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও বোধ হয় এ পর্য্যন্ত প্রচলিত

হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী কোনও আচার ব্যবহারে লিপ্ত হন নাই। খাদ্যাখাদ্য ও আচার-বিচার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদার হিন্দুর মতন জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারকে যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা ইহাকে তাঁর কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, অশ্বিনীকুমার নিতান্ত সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু বলিয়াই সমাজ-বিধি মানিয়া চলেন। আমার মনে হয় যে, যে উপাদানে দ্রোহি-চরিত্র রচিত হয়, অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সে বস্তু কোনও দিনই বেশী ছিল না। থাকিলে তিনি যেমনটী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন ও যে কাজটী করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন বলিয়াও বোধ হয় না।

একটা ছবির মধ্যে যেমন আলো ও ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশেই তার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, মানুষের চরিত্রেও সেইরূপ ভালমন্দ মিশিয়া, তার বিশিষ্টতাকে গড়িয়া তোলে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে যে কিছু দুর্ব্বলতা লোকে লক্ষ্য করে, তাহার সঙ্গেই তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ শক্তিও অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে। এক্ষেত্রে মন্দটুকুকে ছাটিয়া ভালটুকু রাখা সম্ভব হয় না। দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজসিক-তার ফল। সমাজ-সংস্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক। এমন কি, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা অবতার নব নব যুগধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের সকলকেই স্বকার্য্যসাধনের জন্য এই রজোধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য আমাদের দেশের যুগাবতার মাত্রেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক পরশুরামকেই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই, কিন্তু পরশুরামও ব্রাহ্মণকুলেই কেবল জন্মিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করেন নাই ; জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াও কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবেই তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। এই রাজসিকতা হইতেই সর্ব্বপ্রকারের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা আইসে। আর সংস্কার, বিদ্রোহ, সকলই এই

আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোনও দিন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বা এই সংগ্রামশীলতার, বা এই প্রখর রাজসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এগুলি থাকিলে তাঁর চরিত্র এমন মোলায়েম, ও তাঁর জীবনব্রত এতটা সফল হইতে পারিত না।

অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন, য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতাই ব্রাহ্মমতের মূল ভিত্তি। এই দুইটী সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই, ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আর এই যুক্তিবাদ ও অনধীনতার আদর্শ উভয়ই ইংরেজিশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি শিখিয়া আমরা সকলেই এ গুলির দ্বারা একদিন স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারও এ প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে, অন্তর্দৃষ্টি জাগিতে আরম্ভ করিলে এবং সংসারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া সকল বিষয়ের চারিদিক অনুধাবন করিবার শক্তি জন্মিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই প্রথম যৌবনের এই নিরঙ্কুশ অনধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রভাব হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত করিয়া দিতে থাকে। প্রথম যৌবনে আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধিকেই সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে এ পথে যাইলে বস্তুতঃ সত্যে ও মতে কোনও পার্থক্য থাকে না, আর ধর্ম্মের ও সত্যের কোনও সনাতন, সার্ব্বভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না। আমার বিচারবুদ্ধি যদি সত্যাসত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হয়, তবে তোমার বিচার-বুদ্ধিই বা তাহা হইবে না কেন, ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। এ পক্ষে য়ুরোপেও ক্রমে একটা মানসিক অরাজকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই সেখানে সমাজবন্ধন ও

রাষ্ট্রবন্ধন উভয়ই অত্যন্ত শিথিল হইয়া, আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিকে পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। অশ্বিনীকুমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করেন। আর তদবধি তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

এই সদ্‌গুরু তত্ত্বটী যে কি ইহা এখনও আমাদের নব্য শিক্ষিত সমাজ ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। গতানুগতিক পন্থা অবলম্বনে যাঁরা গুরুকরণ করিয়া এদেশে ধর্ম্মসাধন করেন, তাঁরাও কেবল নিষ্ঠাগুণে কোনও কোনও স্থলে সাধনপথে বিশেষ অগ্রসর হইলেও, প্রকৃত গুরুতত্ত্ব যে কি ইহা কিছুই বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। গুরুকরণ ও গুরুশক্তিকে তাঁরা একটা অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন, আর গুরুনির্ব্বাচনেও প্রায় কোনও প্রকারের বিচারবিবেচনা করেন না। অধিকাংশ লোকে কুলগুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ কেহ বা কুলগুরু ত্যাগ করিয়া কোনও সাধুপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইয়া, দীক্ষাগুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলগুরু বা দীক্ষাগুরু এঁদের দু'এর কেহই সদ্‌গুরু নহেন। কুলগুরুতে আর সদ্‌গুরুতে যে প্রভেদ অনেক, একথা আজি কালি একটু আধটু ধর্ম্মচর্চ্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলেই স্বল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন। জন্ম-নিবন্ধন যে কেহ অপরের ধর্ম্মপথের সহায় ও নায়ক হইতে পারে না, এই মোটা কথাটা এদিনে আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকেরা এখন আর কুলগুরু গ্রহণ করেন না; অধিকাংশ লোকে কোনও গুরুই গ্রহণ করেন না, যাঁরা করেন, তাঁরা কোনও সাধুসন্তের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করেন। দীক্ষাগুরু কুলগুরু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও, কেবল ধর্ম্মসাধনেই তিনি

শিষ্যের সহায় হইতে পারেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অপ্রকট ও অব্যক্ত ভগবদ্বস্তুকে আত্মপ্রভাবে শিষ্যের অন্তরে প্রকট ও ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁরও নাই। দীক্ষাগুরু সাধক বা সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত হইতে পারেন; তিনি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রভাবে শিষ্যের চিত্তকে অধিকার করিয়া, তাঁহার অন্তরে সাধনের ও ভক্তির প্রেরণা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সাধ্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এটী কেবল সদ্‌গুরুরই কর্ম্ম। আর এই জন্যই সদ্‌গুরুকে লোকে ও শাস্ত্রে ভগবানের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কুলগুরু বা দীক্ষাগুরুর এই অধিকার নাই। এক অর্থে মানুষ মাত্রই মানুষের গুরু; আর কেবল মানুষই বা বলি কেন, পশু-পক্ষীকীটপতঙ্গাদির নিকটও মানুষ কত শিক্ষালাভ করে বলিয়া তাহারাও গুরুপদবাচ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড় জীব সকলেই এক অর্থে ভগবানের প্রকাশও বটে; সকলেই সেই অব্যক্তকে নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে। সকলেই তাঁর অবতার। কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে সদ্-গুরুকে ভগবানের বিগ্রহ বলা যায় না। ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি বিশ্বাত্মা। কিন্তু জীব তাঁহাকে দেখে কৈ? সকল জ্ঞানকে যিনি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, জ্ঞান তাঁহাকে ধরিতে পারে না। পারে না এইজন্য যে তিনি জ্ঞানের মূলেই আছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে সকলের প্রত্যক্ষ হন না। ভগবান সদ্‌গুরুরূপেই জীবে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকেন। যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই সদ্‌গুরু। ভাগবত ভগবানকেই আচার্য্য বলিয়াছেন—আচার্য্যকে মনুষ্যজ্ঞানে কখনও অসূয়া করিবে না। আর দ্বিবিধরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান জীবের সর্ব্বপ্রকারের অমঙ্গল নিরস্ত করিয়া, তাহার সদ্গতি করিয়া থাকেন। ইহার এক অন্তর্য্যামিরূপ,

আর এক মোহান্ত বা সদ্‌গুরুরূপ। কেবল অন্তরবৃত্তি বা আত্ম-প্রত্যয় বা সহজজ্ঞান বা ইন্‌টুইষণের দ্বারা আমরা কোনও জ্ঞানলাভ বা রসাস্বাদন করি না। অন্তরে যার ছাঁচ আত্মপ্রত্যয়রূপে রহিয়াছে, তার অনুরূপ বস্তু যতক্ষণ না বাহিরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ সেই অন্তরের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে না। ভিতরের ঐ ছাঁচে বাহিরের বস্তু পড়িলেই আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অন্তরের ঐ আত্মপ্রত্যয়কে ইংরেজিতে subjective intuitions বলে—কেবল intuitions ও বলিয়া থাকে। আর বাহিরের বস্তুকে object বলে। ইন্‌টুইষণ বা আত্মপ্রত্যয়কে forms of knowledge, আর বাহিরের বিষয়কে contents of knowledge বলে। এই ছাঁচের বা forms'এর সঙ্গে এই contents বা বস্তুর মিলন হইয়াই সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। আমাদের সদ্‌গুরুতত্ত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে ঈশ্বরের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়রূপে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। যখন বাহিরে ঈশ্বরের ধর্ম্মসম্পন্ন কোনও বস্তুর সাক্ষাৎ-কার লাভ করি, তখনই কেবল আমাদের ভিতরকার ঐ ঐশ্বরজ্ঞান জাগিয়া উঠে। বাহিরে, সংসারে, পিতাকে দেখিয়াই ভগবানের পিতৃত্ব, এখানে মাতাকে দেখিয়াই তাঁহার মাতৃত্ব, এখানকার সখাসখীদের সখ্য আস্বাদন করিয়াই তাঁহার সখ্য, এখানকার মাধুর্য্যসম্ভোগ করিয়াই তাঁহার মাধুর্য্যের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এ সকল জ্ঞান ভিতরেরই বস্তু বটে, কিন্তু বাহিরের সংস্পর্শ-লাভ না করিলে এই ভিতরের জ্ঞান জাগে না। এইজন্য "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে", একদিকে যেমন এই কথা অতি সত্য, সেইরূপ অন্যদিকে, যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এই কথাও ঠিক ততটাই সত্য। ভাণ্ড সত্যের আধখানা, ব্রহ্মাণ্ড তার অপরার্দ্ধ। এই দুই'এতে সত্য পূর্ণ ও প্রকট হয়। এখন

প্রশ্ন এই—ভগবানকে আমরা জানিতে পারি, না জানিতে পারি না। কেবল অন্তর্য্যামিরূপে তাঁহাকে জানিলে, তাঁর আধখানা মাত্র জানা হয়। ফলতঃ বাহিরে তাঁর যে সকল প্রকাশ হয় ও হইয়েছে, সেগুলিকে ছাড়িয়া, তাঁর অন্তর্য্যামিরূপেরও কোনও সত্য ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে আমাদের যে সদসদ্‌জ্ঞান বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে তিনি জাগাইয়া দেন, তার সঙ্গে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের ও সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা যে সমাজে বাস করি, বা যে সকল বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, তারই আশ্রয়ে ফুটিয়া থাকে। বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্য জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাঁহারাই জগতে সকল ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই সদ্‌গুরুতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা। যাঁহার মধ্যে শিষ্যের অন্তরের আত্মপ্রত্যয়-নিহিত ভগবদ্‌ভাব ও ভগবদাদর্শ প্রকট হইয়া, তাহার ভক্তি ও আনুগত্যকে একান্তভাবে টানিয়া লয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরুপদবাচ্য। তাঁহাকে দেখিয়াই শিষ্য ও সাধক, আপনার সাধ্যবস্তুর প্রত্যক্ষলাভ করেন। অবতারেরা যুগে যুগে প্রকাশিত হন, সদ্‌গুরুতে ভগবান নিত্য অবতীর্ণ। এই সদ্‌গুরুতত্ত্বেতেই স্বাধীনতা ও আনুগত্যের, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের, মত ও সত্যের, আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়-প্রত্যক্ষের, সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে। এখানেই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় হয়। অশ্বিনী-কুমার প্রথম যৌবনের ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া, সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পাইয়াই ক্রমে স্বাধীনতার সঙ্গে আনুগত্যের সমন্বয় পক্ষে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন।

অশ্বিনীকুমার এই উদার ও গভীর গুরুতত্ত্ব বুঝিয়া, পরে গুরুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে অতি অল্পলোকেই এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ আমরা আজি কালি যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া থাকি, তাহাতে এই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতেই সহজ নহে। এই তত্ত্ব গুরুগ্রহণের পরে, গুরুকৃপাতেই কেবল, ক্রমে ক্রমে শিষ্যের প্রাণে ফুটিয়া উঠে। একালে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সাধু মহাপুরুষবিশেষের উন্নত ও উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই তাঁদের শরণাপন্ন হন। অশ্বিনীকুমারও, বোধ হয়, এই ভাবেই, তাঁর গুরুদেবের চরণে যাইয়া প্রথমে উপস্থিত হন। একদিকে তাঁর সহজ ধর্ম্মপিপাসা মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপকোপাসনা ও মানস-কল্পিত সাধনভজনে মিটাইতে পারে নাই। অন্যদিকে মামুলী ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের যুক্তিবাদ সত্যের সম্যক্ প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহাতে জ্ঞান ও ভাব, দু'এর কিছুই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। আর এই দ্বিবিধ অভাব পরিপূরণের আশাতেই, বোধ হয়, অশ্বিনীকুমার গুরুগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে, ইংরেজি শিক্ষার ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা র‍্যাশনিলিজ্‌মের (Rationalism) প্রভাবে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়া, পরে গুরুদীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভিতরকার কথাই ইহা। অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের কাহিনী যে অন্যরূপ এরূপ অনুমানের কোনও হেতু আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এই পথে আসিয়া গুরুগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, অশ্বিনীকুমার একেবারেই যে আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুতত্ত্বটী পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেন, এমন কল্পনা করা কঠিন।

সদ্‌গুরুতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, গুরুর চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই

সদ্‌গুরু, অন্তরে যাঁর প্রেরণা জাগে, বাহিরে তিনিই আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেই প্রেরণার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথাই আমাদের দেশের পুরাতন গুরুতত্ত্বের মূল কথা। এই কথাটা বুঝিলে, আত্মপ্রত্যয়ের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর শ্রীগুরুর হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া দুই এক হইয়া দাঁড়ায়। ভিতরে যিনি ধর্ম্মাবহ, অন্তরে আমাদের ধম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে ভালমন্দের উপদেশ দান করেন, তিনিই যদি বাহিরে, চাক্ষুষ "মোহান্ত"-গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তখন এই গুরুর আদেশ আর ইংরেজিতে যাহাকে কনস্থান্স (Conscience) এবং আমাদের আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে বিবেক বলে, এই উভয়ই এক হইয়া যায়। সুতরাং বিবেকবাণী আর গুরুবাক্য সমান মর্য্যাদা ও প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত গুরুতত্ত্ব এই কথাই বলে। তবে ভিতরের conscience বা বিবেকবাণী আর বাহিরের গুরুবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কোন্‌টা বলবত্তর হইবে, একথা ওঠে বটে। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বলে, এরূপ বিরোধ অসম্ভব। ফলতঃ সদ্‌গুরু কে আর সদ্‌গুরু কে নহেন, এখানেই তার প্রকৃত পরীক্ষাও হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু স্বয়ং অন্তর্য্যামী। তিনি শিষ্যের অন্তর জানেন, কেবল ইহাই নহে, তার অন্তরে যে সকল প্রেরণা জাগে তারও প্রেরয়িতা তিনি আপনি। শিষ্যের অন্তরে তিনিই জিজ্ঞাসার উদয় করান, আবার বাহিরে মোহান্তরূপে বা আচার্য্য-রূপে তিনিই শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া, সে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিও আপনিই করিয়া থাকেন। কোন্ পথে, কি ভাবে, শিষ্যের জীবন ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে সে চরম সাধ্য লাভ করিবে, ইহা তিনি জানেন। জানিয়া সেই পথেই অন্তরের প্রেরণা ও বাহিরের উপদেশাদির দ্বারা তিনি তাহাকে অলক্ষিতে লইয়া যান। এই প্রকৃত গুরুপন্থা ত্রিগুণাতীত। এপথে

সংসারের লৌকিক ভালমন্দের বাহ্য বিচার-বিধানের প্রয়োগ চলে না। লৌকিক বিচারে যাহা নিতান্ত মন্দ, তার ভিতর দিয়াও নিয়তই ত মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ভাল ফুটিয়া উঠে। গুরুতত্ত্ব যারা মানেন না, তাঁরাও ত এই কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ মন্দ করে, পাপ করে, অশেষবিধ অহিতাচারে নিযুক্ত হয়, অথচ ভগবান তাহাকে সেই মন্দের, সেই অহিতের, সেই পাপের ভিতর দিয়াই, অপূর্ব্ব কৌশলে, অযাচিত করুণাগুণে, তাহাকে কল্যাণের ও পুণ্যের পথে লইয়া গিয়া দাঁড় করান, একথা সকলেই কহেন। হয় বলিতে হয় যে এ সকল স্থলে ভগবানের বিশেষ বিধান সার্ব্বজনীন কার্য্যকারণসম্বন্ধকে বাতিল করিয়া, পাপীর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, না হয়, ঐ মন্দের মধ্যেই এই ভালর, ঐ পাপের ভিতরেই এই পুণ্যের বীজ লুকাইয়া ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পাপ পাপই প্রসব করে; পুণ্য হইতে পুণ্যই উৎপন্ন হয়। যুক্তি ও নীতি এই কথাই বলে। আর ইহাই যদি এ ক্ষেত্রে শেষ কথা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয়ানী অনন্তনরকবাস, কিম্বা বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ, ভিন্ন, আর কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না। আর নরকবাদ এবং কর্ম্মবাদ, উভয়ই ভাগবতী করুণাকে সঙ্কুচিত ও অসমর্থ করিয়া রাখে। যাঁরা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা মন্দের ভিতর দিয়াই ভাল, অকল্যাণের ভিতর দিয়াই কল্যাণ, পাপের ভিতর দিয়াই পুণ্যের প্রকাশ হয়, এই কথা সর্ব্বদাই মানিয়া লন। আর এই সত্যকে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই, আমাদের ভালমন্দ সকল প্রেরণাই অন্তর্য্যামী পুরুষ হইতে আসে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ফলতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভালমন্দের ভেদাভেদ থাকিতেই পারে না। সে দৃষ্টি সমদৃষ্টি। সে ভাব দ্বন্দ্বাতীত। আর সুখদুঃখ যেমন দ্বন্দ্ব, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, এগুলিও সেইরূপ দ্বন্দ্ব। সম্যকৃদৃষ্টির নিকটে সুখ আর দুঃখ দুই' একই

বস্তুর দুইদিক্ মাত্র, সেইরূপ ভাল এবং মন্দও এই বস্তুর দুইদিক্ ভিন্ন আর কিছু নহে। আজি যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হয়। আজ যাহা ভাল কাল তাহা মন্দ হইয়া পড়ে। দেশ, কাল, পাত্রের বিভিন্নতার দ্বারাই এ সকল ভালমন্দের বৈষম্য ও বিচার হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাকে conscience বা ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বলি, তাহাও ত সর্ব্বদা এক কথা কহে না। এই ধর্ম্মবুদ্ধিরও বিকাশ হয়। এই ধর্ম্মবুদ্ধিও আজ এক কথা, কাল এক কথা বলে। সুতরাং গুরু আজ যাহাকে যে উপদেশ দান করেন, কাল যদি তাহাকে অন্যতর উপদেশ দেন, অথবা একজনকে যাহা আদেশ করেন, অন্যকে যদি তার বিপরীত আদেশ করেন, তাহাতে তাঁর উপদেশের মর্য্যাদা বা প্রামাণ্য নষ্ট হয় না ও হইতে পারে না। তবে প্রকৃত সদ্‌গুরুর উপদেশের সঙ্গে শিষ্যের অন্তরগত প্রেরণার কখনও কোনও গুরুতর বিরোধ হয় না ও হইতে পারে না। হয়না এই জন্য যে তিনি ঐ অন্তর দেখিয়াই উপদেশ করেন। যে উপদেশ শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন উপদেশ করিয়া সদ্‌গুরু কদাপি শিষ্যকে বিব্রত ও অপরাধী করেন না। বরং তিনি তার অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে যে ভাব বা যে আকাঙ্ক্ষা বা যে জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেন, বাহিরে মোহান্তরূপে সেইভাবের, আকাঙ্ক্ষার বা জিজ্ঞাসার উপযোগী উপদেশ দিয়াই, তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া চলেন। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে যে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না, এইজন্য আমরা সদ্‌গুরু দেহধারী মানুষ বলিয়া, তিনিই যে আবার অন্তর্য্যামীও, একথা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। আর এই অক্ষমতা-নিবন্ধনই সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াও, আমরা একান্তভাবে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারও এটী পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁর গুরু যে কেবল বাহিরের উপদেষ্টা নন, কিংবা তাঁর গুরুকৃপা যে একটা অলৌকিক

উপায়ে ভগবানের শক্তি ও দয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁর কল্যাণ সাধন করে না, অপিচ ভগবানই যে ঐ গুরুদেহকে আশ্রয় করিয়া, "চৈত্যবপুষা" —অন্তর্য্যামিরূপে ও মোহান্তরূপে, ভিতরবাহিরে দুইদিকে তাঁহার জীবনকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, এ সকল কথা তিনি ভাল করিয়া ধরিয়াছেন কি না সন্দেহ। আমাদের কাহারই এ পর্য্যন্ত এ ভাগ্য হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই আমরা সংসারতরঙ্গে পড়িয়া দিবানিশি এমন হাবুডুবু খাইয়া থাকি। অশ্বিনীকুমার এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় নীতিবাদকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি খৃষ্টীয়ান্ সাধকের চক্ষেই তাঁর গুরুকে দেখেন, প্রকৃত হিন্দু সাধকের চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা যিশুখৃষ্টকেই গুরুরূপে বরণ করেন। এই গুরু-খৃষ্টবাদ আর আমাদের সদ্‌গুরুতত্ত্ব মূলে একই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দু'এতে প্রভেদ বিস্তর। কোনও হিন্দু আপনার গুরুকে জীবনের আদর্শরূপে বরণ করে না। খৃষ্টীয়ান সাধকেরা যিশুকে তাঁদের জীবনের আদর্শ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিশুর অনুকরণ করাই আধুনিক খৃষ্টীয়ান সাধকের মুখ্য চেষ্টা। যিশু-চরিত্রলাভই এই সাধনার চরম সাধ্য। কিন্তু হিন্দুসাধক কোনও দিন ভগবানকে বা আপনার গুরুকে অনুকরণ করেন না। ভগবানকে তাঁরা ভক্তি করেন, গুরুর উপদেশ তাঁরা পালন করেন, কিন্তু ভগবানকে বা গুরুকে আপনাদের জীবনের আদর্শরূপে কোনও দিন কল্পনা করেন না। তাঁরা অধিকারীভেদ মানেন। জীবের অধিকার এক আর ভগবানের অধিকার অন্য। শিষ্যের অধিকার এক আর গুরুর অধিকার অন্য। ভগবান বিশ্বে কতভাবে লীলা করিতেছেন ; তিনি সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, বিনাশ করেন, সকলই করেন। তিলি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নির্ম্মম ভাবে নষ্ট করেন। তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পাপী পাপ করে ;

আবার পুণ্যাত্মারা সেই শক্তির প্রেরণাতেই পুণ্যকর্ম্ম করেন। এ সকলই তাঁর দ্বারা হইতেছে। জীবের পক্ষে ভগবচ্চরিত্রলাভ কেবল অসাধ্য যে তাহা নয়, ভগবানের অনুকরণের ইচ্ছামাত্র মহাপাপ। সদ্‌গুরু সম্বন্ধেও ঐ কথা। সদ্‌গুরু ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভগবল্লীলারসে নিমগ্ন হইয়া, কত প্রকারের আপাতবিসদৃশ কথা বলেন ও বিসদৃশ কর্ম্ম করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে তাঁরা বিভিন্ন উপদেশ দেন। একজনকে যাহা বিহিত ও ভাল বলিয়া আচরণ করিতে বলেন, অন্যজনকে তাহা অবিহিত ও মন্দ বলিয়া বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। এ অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে আপনার অধিকারকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া, গুরুর অনুসরণ করা অসম্ভব। এরূপ প্রয়াসেও গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এ সকল নিগূঢ় কথা ভাল করিয়া ধরিতে পারে না। আমাদের নীতিবাদ সকল মানুষকে ভগবচ্চরিত্রলাভ করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু গুরুর অনুকরণ করা নহে, অনুগত হওয়াই শিষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। হিন্দু শিষ্য তাহাতেই কেবল এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—

> জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
> জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা একালে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা হিন্দুর এই সদ্‌গুরুতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। খৃষ্টীয়ান সাধনাতেও এই তত্ত্ব যে একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা নহে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে এই তত্ত্বের উপরেই খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান

যখন অতিলৌকিক শাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণ্য নষ্ট করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বকে মানুষের সহজবুদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন খৃষ্টীয়ান দার্শনিকেরা এই আত্মপ্রত্যয়বাদের অপূর্ণতা দেখাইয়া, এই আত্মপ্রত্যয়কে পূর্ণ করিবার জন্যই, যিশুখৃষ্টকে ভগবানের বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। বাহিরে সত্যের প্রকাশ না হইলে ভিতরে তার যে সহজজ্ঞান রহিয়াছে তাহা ফোটে না ও জাগে না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের একটা সহজ জ্ঞান, আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইষণ আমাদের প্রকৃতির ভিতরে, প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, ইহা সত্য হইলেও, যতক্ষণ বাহিরে, বিষয় রাজ্যে কোনও বিশেষ কারণ হইতে একটা বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে না দেখা যায়, ততক্ষণ এই আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইষণ যে জাগে না, ইহাও ত তেমনি সত্য। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল একটা আত্মপ্রত্যয় আছে, ইহা মানিলেই ঈশ্বরসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইবার জন্য তাহার উপযোগী বহির্বিষয়ের প্রকাশও অত্যাবশ্যক হয়। কেবল মনোগত আস্তিক্যবুদ্ধিতে ভগবৎপ্রতিষ্ঠা হয় না। ভগবানকে বাহিরেও দেখিতে হয়। এই জন্যই তাঁর অবতারের প্রয়োজন। অবতার ব্যতীত সত্য ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না। যিশুখৃষ্ট মানুষের ঐশ্বরিক আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইষণের বহির্বিষয়রূপে প্রকট হইয়া, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। এই ভাবেই বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর উদার ও উন্নত য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান আত্মপ্রত্যয় বাদের সঙ্গে অবতারবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া, ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্যকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এখানেই এই আধুনিক খৃষ্টতত্ত্ব আমাদের পুরাতন সদ্‌গুরুতত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিক উন্নত ও উদার খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে যিশুখৃষ্টই, সদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কিন্তু আমরা যে খৃষ্টীয়ান সিদ্ধান্তের কথা সচরাচর এদেশে শুনিতে পাই, তাহাতে এ সকল গভীর কথার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। মামুলী খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে এ তত্ত্ব এখনও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই। প্রচলিত য়ুরোপীয় দর্শনাদিতেও এই সত্যটা এখন পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং আমরা ইংরেজি শিখিয়া ইহার কোনই পরিচয় পাই না। আমাদের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা এখনও খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় সমাজেও এখন অনেক লোকে যিশুখৃষ্টকে কেবল একজন আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে এই ভাবটাই য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টেতে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ অপেক্ষা, আপনার সাধনবলে খৃষ্টচরিত্রের অনুশীলন ও অনুকরণ করিয়া ঐ উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্রলাভই এখন খৃষ্টীয় সাধনের সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান সাধু ও সাধকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে এখন—"যিশু এই অবস্থায় কি করিতেন?" এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিয়া থাকেন, আর তিনি যাহা করিতেন, যেরূপ চলিতেন, তাহা করিতে ও সেইরূপ চলিতেই চেষ্টা করেন। অশ্বিনীকুমারও, আমার মনে হয়, কতকটা এরূপভাবেই আপনার গুরুদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর বিস্তৃত কর্ম্মজীবনে যখনই যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই—এ অবস্থায় তাঁর গুরুদেব কি করিতেন, তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়া, তার যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়াই, আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছেন। আর এই জন্যই সময় সময় লোকে তাঁর কর্ম্মজীবনে কতকটা দুর্ব্বলতা, এমন কি অব্যবস্থিততা এবং অসামঞ্জস্যেরও পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছে।

হিন্দুর নিকটে ইহা গুণের কথা না হইয়া, অত্যন্ত দোষের কথাই হয়। হিন্দুর সাধনার একটা অতি মামুলী কথা আছে যে দেবতাদের উপদেশেরই অনুসরণ করিবে, কদাপি তাঁহাদের কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না। আমাদের বিদেশীয় ভাবাপন্ন বিচারবুদ্ধি প্রায়ই এ কথাটাকে উপহাসাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। কখনও কখনও ইহাকে অতিশয় হীন বাক্য বলিয়াও ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে বলে উপদেশ অপেক্ষা আচরণ শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে দেবতাদের আচরণ যদি ধর্ম্মবিগর্হিত হয়, তবে তাহাদের আদেশের বা উপদেশের কোনও মূল্য ও সত্য থাকে না। কিন্তু য়ুরোপীয় সাধনা আমাদের অধিকারীভেদ মানে না। অথচ এই অধিকারীভেদই হিন্দুর সাধনার মুখ্য কথা। আমাদের সকল সাধনভজন, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধিনিষেধাদি এই অধিকারীভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই দেবতার অধিকারে যা সাজে ও যাহা ধর্ম্ম, মানুষের তাহা সাজে না, মানুষের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম, ঈশ্বরকে মানুষের আদর্শ করিলে, সমাজধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম সকলই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। হিন্দু একেশ্বরবাদী, অদ্বৈততত্ত্বের উপরে হিন্দুর সকল সিদ্ধান্তের ও সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, শাক্ত, শৈব, সকল সিদ্ধান্তই কোনও না কোনও আকারে এই অদ্বৈততত্ত্বকে মানিয়াছেন। আর মূলতত্ত্ব এক বলিয়া, বিশ্বের বহুধা প্রকাশের বা অভিব্যক্তির মধ্যে আপাতত বিরোধ ও বৈষম্য যাই থাকুক না কেন, মূলে একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য আছেই আছে। একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ, একান্ত পাপ বা একান্ত পুণ্য বলিয়া কোনও কিছু জগতে নাই। এক ক্ষেত্রে যাহা ভাল অন্য ক্ষেত্রে তাহাই মন্দ। এক অবস্থায় ও এক অধিকারে যাহা পাপ, অন্য অধিকারে তাহা পাপ নহে। এ সকল কথা হিন্দু সাধনার গোড়ার কথা, সুতরাং মানুষের চক্ষে ও মানুষের

পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার পক্ষে তাহা দোষাবহ হয় না। জগতের সকল কর্ম্মের মূল কর্ত্তা যখন ঈশ্বর, তখন সকল কর্ম্মাকর্ম্মই তাঁহার কৃত। তিনি আদি কারণ, তিনি অনাদি কারণ। তিনি সর্ব্ব-কারণ। কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলেরই মূল ও কর্ত্তা তিনি। এ অবস্থায় তিনি জীবের আদর্শ হইতে পারেন কি? মানুষ ভগবানের অনুকরণ করিতে গেলে, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই লোপ পায়। এইজন্য হিন্দু এমন কথা কখনও বলে না। হিন্দু ভগবানকেও যেমন আপনার জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে না, তার গুরুকেও সেইরূপ আদর্শরূপে ভাবে না। গুরুর উপদেশই মানা, তাঁর কর্ম্ম অনুকরণীয় নহে। শিষ্যকে তার আপন অধিকার মতন তিনি চালাইয়া লইয়া যান, আর নিজে আপনার অধিকার মতন চলিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ না করিলে কেহ সদ্‌গুরু হইতে পারেন না। আর যাঁরা ভাগবতী তনুলাভ করিয়া সংসারে ভগবানের লীলা-বিগ্রহরূপে বিচরণ করিয়া জীবকে ভগবানের দিকে লইয়া যান, স্বয়ং ভগবানের চরিত্র যেমন প্রাকৃতজনের অনুকরণীয় নহে, তাঁহাদের চরিত্রও সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হয় না। খৃষ্টীয় দশ-আজ্ঞার মাপকাঠির দ্বারা এ সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত্রের কালি কষা যায় না। লৌকিক নীতির বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ নহেন, তাঁরা নিজেরাই এ সকল নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুচরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁরা ভিতরে যে প্রেরণা প্রেরণ করেন, ও বাহিরে যে সকল ব্যবস্থা ও ঘটনার যোগাযোগ সাধন করেন, তাহার অনুগমন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া আমাদের পক্ষে এরূপ বশ্যতা স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তারই জন্য আমরা গুরুচরিত্রের অনুকরণ করিতে যাইয়া পদে পদে ভয়াবহ পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি।

আমাদের সকলেরই এই দশা। হিন্দুয়ানী ও খৃষ্টীয়ানীর একটা

অদ্ভুত মিশ্রণে আমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে এই দুইটী ভাবই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই কারণেই সময় সময় তাঁর আচার-আচরণে দুর্ব্বলতা ও অসামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে।

অশ্বিনীকুমারের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি নাই। কোন একটা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। সেই জন্যই এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রের এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা যথাযথ সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের দিক্ দিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত প্রাচ্যকে দেখেন নাই, বা প্রাচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাবই তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দিরে, যুবকবৃন্দের শিক্ষাগুরুরূপে, প্রচারকরূপে, শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকারের রক্ষিরূপে তাঁহার চরিত্রে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাই। অপরপক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে, ভাগবতাবৃত্তিতে, এবং ভক্তিযোগ বা কর্ম্ম-যোগের ব্যাখ্যানে—তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ভাবই বেশী ফুটিয়া উঠে।

আর এই হিন্দুভাব লইয়াই আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যলভ্য লোক-নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র একজন লোক-শিক্ষক এবং আধুনিক জন-নায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। সে হিসাবেও তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নহে। পরন্তু, আমার বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গে—যশোহর হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত—নব্যশিক্ষিত যুবকসমাজে তাঁহার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার বরিশালস্থ কলেজে, তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের

এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তত্রাচ, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিত্তের উপরে তিনি যে ভক্তির আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর হিন্দুত্বেই অশ্বিনীকুমারের লোক-নায়কত্বের মূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাবই বলবত্তর। আধুনিক সাধনায় মানুষকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্বের উপরেই আজিকার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। নর-সেবাই দেব-সেবা। আর ইহার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব সাধনার অতি সুন্দর মিল রহিয়াছে। নরের মধ্যে নারায়ণকে দেখাই, বৈষ্ণব সাধনার মূল সাধ্য—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং"—

ইহাই বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলসূত্র। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এমন স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে মানবের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্তবৃত্তিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-পুত্র, নায়ক-নায়িকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব। মানবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহার চিত্তবৃত্তির বিনাশে বা বিরোধে নহে, কিন্তু এ সকলকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ভাব অশ্বিনীকুমারের সামাজিক আচার ব্যব-হারে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের পরি-পোষক ; কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি

জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, কলেরা বা অন্য মহামারীর প্রকোপের সময়, তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, উচ্চনীচ জাতিনির্ব্বিচারে, পীড়িতের সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। হতভাগিনী পতিতারাও তাহাদের সে সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া, স্বহস্তে নীচজাতীয় রোগীর বিছানাদি, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত, পরিষ্কার করিয়াছে; এমন কি সময়ে সময়ে, লোকাভাব ঘটিলে, অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির মৃতদেহও আপন স্কন্ধে বহিয়া সৎকার করিয়া আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সেবা পাইয়া আসিয়াছে। বহুবৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিত্বের মোহিনী শক্তি বলেও নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনী-কুমারে এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আভাস পাই। তত্রাচ, এ ভাব এ দেশে নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন। দেশ-কাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই মাত্র!

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার ইতিহাসে গুরুদাস বাবুর স্থান

বাঙ্গলা দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাস বাবুর নাম থাকিবে কি না, জানি না। না থাকাই সম্ভব। ইতিহাস সচরাচর যে সকল বস্তুর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করে, গুরুদাস বাবুতে সে বস্তু বেশি নাই। যাহা অলোকসামান্য, ইতিহাস কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে। গুরুদাস বাবুর এরূপ অলোকসামান্য কোনো কিছু নাই। তাঁর অনেক বিদ্যা আছে, কিন্তু অনন্যসাধারণ বিশেষজ্ঞতা নাই। শ্রেষ্ঠ মেধা আছে, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা নাই। গুরুদাস বাবু কর্ম্মী; আর তাঁর কর্ম্ম সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও নীতি, শাস্ত্র ও লোকাচারের সম্মান করিয়া চলে। এই জন্য যাঁহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ-কোলাহল-মুখর কর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া, সস্তায় একটা ঐতিহ্য-কীর্ত্তি অর্জ্জন করে, গুরুদাস বাবু সে জাতীয় কর্ম্ম-নায়ক নহেন। তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করে; এতটা শ্রদ্ধা বাঙ্গলাদেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ হইতে, আর কাহারো প্রতি অর্পিত হইতেছে কি না, সন্দেহ। দেশের লোকে তাঁহার বিদ্যার সম্বর্দ্ধনা করে; তাঁহার বিনয়-সৌজন্যের সমাদর করে; তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ধর্ম্ম-নিষ্ঠার ও আত্মনিষ্ঠার পূজা করিয়া থাকে। সকল প্রকারের জন-হিতকর কর্ম্মে তাঁহার নেতৃত্ব কামনা করে। সকল স্বাদেশিক সাধু-অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য, তাঁর পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু তিনি যে তাহাদের চিন্তা ও ভাব, আশা ও আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া, অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাহাদের অন্তর্জ্জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছেন, এমনটী কখনো অনুভব করে না। আর এ জগতে যাঁহারা,

মিত্রভাবেই হউক আর শত্রুভাবেই হউক, আপনাদের সমসাময়িক জনমণ্ডলীর জ্ঞান, রস, আশা, আদর্শ, প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া থাকেন, ইতিহাস কেবল তাঁহাদেরই স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক কীর্ত্তির বিশেষত্ব

কিন্তু ইতিহাসে যাহাদের নাম থাকিয়া যায়, কেবল তাঁহারাই যে সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, কেবল তাঁহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ ও অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের নিকটে থাকে না, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। ফলতঃ ইতিহাস যে কেবল ভালকেই মনে করিয়া রাখে, মন্দকে ভুলিয়া যায়, তাহাও নহে। রোমের ইতিহাস পুণ্যশ্লোক মার্কাস্ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি ক্রূরমতি নীরোরও নামকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রামও আছেন, রাবণও আছেন; যুধিষ্ঠিরও আছেন, দুঃশাসনও আছেন। ভারতের পুণ্যস্মৃতি জনকের নামও মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, বেণ রাজার নামও ভুলিয়া যায় নাই। ইতিহাস কেবল ভালকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে, মন্দকে রাখে না, তাহা নয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু অলোকসামান্য, ইতিহাস তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। মানবের প্রকৃতি হইতেই তো ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি। আর যাহা নিত্য, তাহা অপেক্ষা যাহা নৈমিত্তিক, যাহা স্থিতিহেতু, তাহা অপেক্ষা যাহা গতি-সহায়; মানুষের মন তাহারই দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে যাঁহারা জনসমাজের স্থিতির সহায়, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা জনসমাজের গতির হেতু হইয়া উঠেন, ইতিহাস তাঁহাদিগের স্মৃতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়া রাখিতে

চাহে। যে সকল শক্তির সমবায়ে বা সংঘর্ষণে সমাজ-জীবন বিবর্ত্তিত হয়, ইতিহাস তাহাকেই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে। আর সমাজ-বিবর্ত্তনে ভাল ও মন্দ দুই মিশিয়া থাকে। আলো ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে যেমন কোনো তৈলচিত্র ফুটিয়া উঠে না ; যেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষ ব্যতীত সমাজজীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও মন্দের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারই দ্বারা, সেই বিরোধের ফলস্বরূপই, জনসমাজ বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই দেবাসুর-সংগ্রাম মানব-সমাজের নিত্য ধর্ম্ম। আর তারই জন্য, এই মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যে ইতিহাসের কর্ম্ম, সেই ইতিহাস লোকে যাহাকে ভাল বলে কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে না ; কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহা কিছু অনন্যসাধারণ, যাহা কিছু গতির কারণ, ইতিহাস সর্ব্বদা তাহাকেই নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রণালী

আর অলোকসামান্য প্রতিভাই সচরাচর জনমণ্ডলীর প্রাণে নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন আশার সঞ্চার কয়িয়া, যুগে যুগে সমাজের এই গতিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়া থাকে। এই সকল নূতন ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহা পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার জন্য জনগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নূতন কর্ম্মের আয়োজন, এবং এই কর্ম্মচেষ্টা হইতেই সমাজের বিবর্ত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়। অলোকসামান্য প্রতিভা সমাজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইতিহাসে তাহার এত গৌরব। কিন্তু জনসমাজের কল্যাণকল্পে যেমন তার গতি-শক্তির তেমনি তার স্থিতিশক্তিরও আবশ্যক। যেখানে সমাজের গতি-শক্তি তার সনাতন স্থিতি-শক্তিকে একান্তভাবে অভিভূত

করিয়া ফেলে, সেখানেই সমাজ-চৈতন্য একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া, উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির ক্রীড়াপুত্তলি হয় এবং অচিরে বিনাশের মুখে যাইয়া পড়ে। আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শক্তি একান্তভাবে তাহার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে, সেখানে কিছুদিনের জন্য সমাজ নিতান্ত স্থবির হইয়া পড়ে এবং শুদ্ধ গতানুগতিক পথ ধরিয়া জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয়, জীবন-চেষ্টা প্রকাশ করিতে পারে না। আর স্বভাবের গতিরোধ করিয়া কিছুকালের জন্য স্থবিরত্ব লাভ করে বলিয়াই, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ, পরিণামে প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়াই পড়ে। এই জন্য, সমাজের চিরন্তন কল্যাণকল্পে, তাহার স্বাভাবিক বিবর্ত্তন-পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে হইলে, তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয় শক্তিকেই, আপন আপন অধিকারে, সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক হয়।

সমাজ-জীবনের ত্রিধারা

কারণ, জনসমাজের বিবর্ত্তন-চেষ্টা গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন করিয়া চলে। একদল লোক যখন কোনো অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ আন্তরিকভাবে সমাজের গতিবেগকে বাড়াইয়া তুলিতে চান; অপর এক দল লোক তখন, সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্যবস্থার এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্ত্তন যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং এই পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর অকল্যাণ সাধিত হয়, ইহা বিচার না করিয়া, সমাজস্থিতির দোহাই দিয়া, প্রাণপণে এই প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আর এই দুই দলই সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে,

ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহেন। কিন্তু যাঁহারা এক দিকে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে সমাজের গতিবেগকে আত্যন্তিক ভাবে বাড়াইয়া তোলেন, তাঁহারা যেমন সমাজের স্থৈর্য্য ও শান্তি নষ্ট করিয়া, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তুকে পীড়িত করেন ; সেইরূপ যাঁহারা অন্যদিকে অভিনব যুগধর্ম্মের ও কালধর্ম্মের প্রতি অমনস্ক হইয়া, এই প্রবুদ্ধ গতিবেগকে জোর করিয়া প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহারাও সেইরূপই অযথা সংগ্রাম বাঁধাইয়া, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়াই, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যাঁহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া, ধীরভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ না এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়া নূতনের ও পুরাতনের মধ্যে একটা উচ্চতর সন্ধি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ কোন এক পক্ষকে একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে, এই কলহ-কোলাহলের মধ্যে সমাজের মর্ম্মস্থলে যে সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়া বসিয়া রহেন,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কোন সমাজে, কালপ্রভাবে, তাহার পূর্ব্বকৃত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্ম্মবশে, এইরূপ সমর-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, যাঁহারা নূতনের লোভেও আত্মবিস্মৃত হন না, আর তার ভয়বিভীষিকাতেও বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন না,—কামবশাৎ নূতনকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের জীর্ণতাকেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহেন না ; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গুণাগুণ ও দাওয়াদাবীর পরীক্ষা হইয়া পরিণামে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, ধীরভাবে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন,—প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের সনাতনী প্রাণশক্তি তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে। কলহকোলাহলপ্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের খোঁজ লয় না। কিন্তু ইতিহাসের

দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও, আসন্ন-সমাজ-বিপ্লবের মুখে, এই সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ, শান্ত ও সমাহিতচিত্ত সুধীজনই অতি সন্তর্পণে, সেই সঙ্কটকালে, সমাজের সনাতন প্রকৃতিটীকে প্রাণে পূরিয়া বাঁচাইয়া রাখেন।

গুরুদাস বাবু ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়

বাঙ্গলার স্বদেশী সমাজ একটা প্রবল বিপ্লবস্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এই সঙ্কটকালে যে অত্যল্পসংখ্যক ধীর-প্রকৃতি সুধী-জনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজের সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাস বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। যে বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, গুরুদাস বাবু সেই শিক্ষা ও সাধনাকে সুন্দররূপেই অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি অগ্রণী। যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে, গুরুদাস বাবু তাহার অন্যতম অধিনায়ক। কিন্তু গুরুদাস বাবুর সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই যেরূপভাবে এই শিক্ষাদীক্ষারদ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গুরুদাস বাবু কখনো সেরূপ হন নাই। অন্যদিকে যাঁহারা এই শিক্ষাদীক্ষা পাই-য়াও, ইহার প্রতি একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ বশতঃ এই শিক্ষা-দীক্ষাতে দেশ মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের স্রোত আনিয়াছে, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন; গুরুদাস বাবু কখনো একান্তভাবে তাঁহাদেরও সঙ্গে মিশিয়া যান নাই। মানুষের বিদ্যা তাহার ভৃত্য হইয়াই থাকিবে, তাহারই ঈপ্সিতসাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত হইবে; ইহাই বিদ্যালাভের সত্যলক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা

আজিকালি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে বিদেশীয় বিদ্যা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি, তাহা অনেক স্থলেই আমাদের ভৃত্য না হইয়া, আমাদের প্রভু হইয়াই বসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব বিদ্যাকে নিজেদের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না; প্রত্যুত এই বিদ্যাই আমাদিগকে ভয়াবহ পর-ধর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের শিক্ষা ও সাধনা তাহার আত্মজ্ঞানেরই স্ফুরণ করিবে; ইহাতেই শিক্ষাদীক্ষার স্বার্থকতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ না করিয়া, অনেক সময় কেবল আত্মবিস্মৃতিই জন্মাইয়া দেয়। এই বিদেশী বিদ্যার বলে আত্মলাভ করা দূরে থাক্, অনেক সময় আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াই বসি। এইরূপ আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিক্রয় আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সংস্কারক ও সংস্করণ-বিরোধী, উভয় দলেরই মধ্যে ইহা দেখা যায়। এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক সর্ব্বজনসমক্ষে, স্পর্দ্ধাসহকারে, নির্ল্লজ্জভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা এই প্রকাশ্য প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও গোপনে গোপনে সেই বিজাতীয় ভাবকেই অজ্ঞাতসারে প্রাণ মধ্যে বরণ করিয়া তুলিতেছেন। ভগবানকে যেমন মিত্রভাবে ভজনা করিয়াও পাওয়া যায়, শত্রুভাবে সাধন করিয়াও পাওয়া যায়, আর শাস্ত্রে বলে, শত্রুভাবে সাধন করিলে যত সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, মিত্রভাবের ভজনায় তত সত্বর হয় না;—সেইরূপ কোনো বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনাকেও মিত্রভাবে ও শত্রুভাবে, উভয় ভাবেই পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা মিত্রভাবে য়ুরোপের ভজনা করিতেছেন। সংস্করণ-বিরোধী "পুনরুত্থানকারিগণ" শত্রুভাবে তার সাধনা করিতেছেন। আর কার্য্যতঃ উভয় পক্ষই সমভাবে তাহার দ্বারা অভিভূত

হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণের উপরে য়ুরোপের প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্করণ-বিরোধিগণের উপরে প্রচ্ছন্ন—দু'এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ।

"সংস্কারক" ও সংস্করণ-বিরোধী

সংস্কারকগণ অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশীয় সমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদিকে যথাসাধ্য নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। আর এইরূপে বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বাহ্য উপকরণগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করিতে যাইয়া, স্বল্পবিস্তর আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। স্বদেশী সভ্যতা ও সাধনার যে একটা অতি ভাল দিক্ আছে, এ কথা ইহাঁরা অস্বীকার করেন না। বরং এই ভালটুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই যে সংস্কারের প্রয়োজন, ইহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো সমাজের বহিরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করিয়া তার ভিতরকার প্রকৃতিগত আদর্শ ও স্বভাবকে বর্জ্জন করা যে কখনো সম্ভব হয় না, এটী তাঁহারা বোঝেন না। বিদেশীয় সমাজের বাহিরের উপকরণ ও আয়োজনগুলিকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিব, আর স্বদেশের সমাজের ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং তাহারই মধ্যে পূরিয়া দিয়া একটা উৎকৃষ্টতম সমাজ গড়িয়া তুলিব, ইহা যে একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য,—এই মোটা কথাটা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। প্রত্যেক জীবের আত্মপ্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের বহিরঙ্গগুলি একটা আকস্মিক ঘটনাপাতের অচেষ্টিত ফল নহে। সমাজ-জীবন এবং সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে, আপনা হইতে গজায় না, অথবা অন্য সমাজ হইতেও উড়িয়া আসিয়া

জুড়িয়া বসে না। দেহের সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ যেমন অঙ্গাঙ্গী—ইংরেজিতে ইহাকে অর্গেনিক রিলেষণ (Organic relation) বলে—প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাজ-জীবনের সম্বন্ধও সেইরূপ অঙ্গাঙ্গী, আকস্মিক নহে। কাণ টানিলেই যেমন আপনা হইতেই মাথাও সরিয়া আইসে, সেইরূপ কোন সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাটটাকে কোথাও খাড়া করিতে গেলেই, তার প্রাণটাও যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত। বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গসাধনে নিযুক্ত হইলে, তার অন্তরঙ্গটুকুকেও লইতেই হইবে। আর এরূপ ভাবে, স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তার দেহ ও প্রাণ উভয় বস্তুকেই যদি আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য প্রাণটাকে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, তাঁরা বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার ভাল ভাল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই গুণিয়া বাছিয়া, নিজের সমাজে গ্রহণ করিবেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের সনাতন আদর্শটীকেও বাঁচাইয়া রাখিবেন, ইহা নিতান্তই অলীক কল্পনা মাত্র। প্রত্যেক সভ্যতা ও সাধনাতেই ভাল ও মন্দ দুই আছে। আর এই ভাল ও মন্দ, ছায়াতপের ন্যায়, পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে। সকল সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যেই ভাল ও মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি ও আচার-বিচার, সামাজিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, সে সমাজে, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রের মধ্যেই ভালকে রক্ষা করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একটা অপূর্ব্ব কৌশলও আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। অপর সমাজ যদি এই সকল রীতিনীতি বাহির হইতে গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে, ভাল মন্দ দুই তাহাকে লইতে

হয়। কিন্তু তার ভালটীকে বাড়াইয়া দিয়া মন্দটীকে রোধ করিবার এই সহজ কৌশলটী সে সমাজ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। কারণ এই সহজ কৌশলটী ধার করিয়া পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই অনুকরণ-প্রয়াসী সংস্কারচেষ্টা, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া, সর্ব্বদাই ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-ও-সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গসাধনে সচেষ্ট হইয়া, সেই সমাজের ভিতরকার ভাব ও আদর্শের দ্বারা উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া, তাহারই ফলে স্বদেশের ভিতরকার সনাতন প্রাণস্রোতের বাহিরে যাইয়া পড়িতেছেন; সংস্করণ-বিরোধিগণও সেইরূপই, অন্যভাবে ও অন্য কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-স্রোত হইতে একান্তভাবেই সরিয়া যাইতেছেন। সংস্কারকগণ বিদেশীয় সমাজের বাহিরের আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শটীকে পূরিয়া, তাহাকে সময়োপযোগী ও কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পরদেহে যে সে প্রাণ থাকিবে না, থাকিতে পারে না; তৎপ্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। সংস্করণ-বিরোধিগণ বিপরীত পথ ধরিয়া স্বদেশের সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্রাণটাকে পূরিয়া দিয়া, নিজেদের সমাজের বাহ্য ঠাটটাকে সতেজ ও সময়োপযোগী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই নবীন প্রাণের টান যে কখনই সহিতে পারিবে না, তৎপ্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। আর এইরূপ উভয় পক্ষই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণ নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গটাকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, বিদেশীয় সমাজের ছাঁচে, নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে একটা পাদ্রিজনসুলভ,

কল্পিত, বিশ্বমানবী প্রেমের প্রেরণাই আছে; নিজেদের সমাজ-জীবন ও সমাজ-প্রকৃতির কোনো সত্য ধারণা নাই। অন্যদিকে যাঁহারা প্রাণপণে এই সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিয়া, সমাজের "সনাতনী"টুকুকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ব্যাকুলতাতে তাঁহাদের সরল স্বদেশপ্রীতিই প্রকাশিত হয়, কিন্তু নিজেদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রাকৃতজনসুলভ দেহাত্মধ্যাসটা যে বিন্দু-পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা সমাজের দেহটাকেই, তার বাহ্য বিধিব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকেই সমাজের সনাতন প্রাণ বলিয়া ধরিতেছেন আর তারই জন্য, কালের প্রভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া, সমাজের বাহিরের ঠাটটাকে রক্ষা করিলে তার ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা পাইবে ভাবিয়া, যাঁহারা এই ঠাটটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেছেন। এইরূপে আমাদের সংস্কারকদল যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে, দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজগঠনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থলে বিলাতী আদর্শের একটা রজত-প্রধান শ্রেণীভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন; সেইরূপ সংস্করণ-বিরোধিগণও আশ্রমভ্রষ্ট সুতরাং ধর্ম্মহীন যে বর্ত্তমান বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত আছে, তারই ভিতরে বিলাতী শ্রেণীভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্ষয়োন্মুখ বহিরঙ্গটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দেহটাকে, আর একদল তার প্রাণটাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন। সুতরাং একপক্ষ সজ্ঞানে, আর একপক্ষ অজ্ঞাতসারে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমভাবে, সত্যকার স্বাদেশিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই

দুই দলই, দুই ভিন্ন দিক দিয়া, দেশের সত্যিকার সনাতন সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

গুরুদাস বাবুর "মধ্যপথ"

গুরুদাস বাবু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিদলের কোনটারই অন্তর্ভূর্ত নহেন। প্রচলিত অর্থে, তাঁহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি নিজেই কোন মতে সংস্করণবিরোধী বলিয়া পরিচিত হইতে রাজি নহেন। মানব-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ইহা তিনি জানেন। মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও, মোটের উপরে এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন যে উন্নতিমুখী, ইহাও তিনি মানেন। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন রীতিনীতিও যে পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। "হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকের অনেক কার্য্য আছে"—এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। * সুতরাং মোটের উপরে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, প্রচলিত সমাজসংস্কারকদিগের সঙ্গেও গুরুদাস বাবুর মতের মিল আছে। তবে মতের মিল থাকিলেও কার্য্যের মিল নাই। তারই জন্যই গুরুদাস বাবুকে প্রচলিত অর্থে সমাজসংস্কারক বলা সঙ্গত নহে। সমাজসংস্কারকেরা সচরাচর সমাজের গতির বেগটাই বাড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত; তার গতির দিক্‌টা স্থির রহিল কি না, তৎপ্রতি তাঁহাদের তেমন সজাগ দৃষ্টি নাই। আর এই খানেই তাঁহাদের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর যা' কিছু বিরোধ। সাধারণভাবে সমাজসংস্কারকদিগের সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর আন্তরিক সহানুভূতিই আছে। এই জন্য আপনি নিষ্ঠাবান ও একান্ত স্মৃতি-অনুগত হিন্দু হইয়াও, গুরুদাস বাবু

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—৩১৭ পৃষ্ঠা।

কখনো শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধী সংস্কারক-সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং তাঁরা যে সাধু-ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই ইচ্ছার সফলতার জন্যই, তাঁহাদিগকে "অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে" চলিতে বলেন।*

হিন্দুর সমাজানুগত্য

এই সংযম ও সম্যক্‌দৃষ্টিই গুরুদাস বাবুর কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র। সমাজের কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন মত, তার প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কোন চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী নহেন। প্রাচীনকে বর্জ্জন করাই যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্ত্তন-ইতিহাসে এমন অদ্ভুত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রাচীন ও প্রচলিত তাহাকে ভাঙ্গাই যে অধর্ম্ম, গুরুদাস বাবুও এমন মনে করেন না। আবশ্যক হইলে, হিন্দু তাঁর দেবতার মন্দিরও তো ভাঙ্গিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভাঙ্গার ভাব ও ধরণ পৃথক্। সে ভাঙ্গাতে তাঁর দেবতাও লুপ্ত হন না, তাঁর দেবভক্তিও নষ্ট হয় না। দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই তো দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা। তারই জন্য তো সামান্য ইঁটকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির বিষয় হইয়া উঠে। হিন্দুর সমাজ, সেইরূপ, হিন্দুর ধর্ম্মের বহিরাবরণ ও কায়ব্যূহ-স্বরূপ। ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ বলিয়া হিন্দুর শ্রুতি যাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত নিরাকার ভাবমাত্র নহেন। কেবল মানুষের হৃদয়-আকাশেই তাঁর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের প্রাণে, তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন; সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করেন, সেই সমাজ-দেহে, তার রীতিনীতি এবং

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—২৮০ পৃষ্ঠা।

বিধিব্যবস্থার মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রত্যেক সমাজের বিধিব্যবস্থা, সেই সমাজের প্রাণগত ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব হিন্দু আপনার দেহকে যেমন দেবতার মন্দির বলিয়া ভাবেন, তাঁর দেহ-পুরে যেমন তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্ব-লোকসাক্ষী নারায়ণকেই একমাত্র পুরস্বামীরূপে দেখিয়া সংযত চিত্তে, পবিত্রভাবে দেহের সেবা করেন; সেই রূপ আপনার সমাজকেও হিন্দু সেই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ পরমপুরুষের বহিরঙ্গ ও কায়ব্যূহ বলিয়া ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে তাঁর সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হয়।

হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব

কারণ, হিন্দুর নিকটে তাঁর সমাজ, কতকগুলি মনুজগোষ্ঠির স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত বা ঘটনাক্রমে সংগঠিত, একটা মিলনভূমি নহে। মানুষ কখনো ইচ্ছা করিয়া, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এ সকল স্বকৃত সমাজ তার মূল সমাজেরই অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে সমাজের সমধর্ম্ম লাভ করে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, ভারত-সভা, জমিদারী-পঞ্চায়ৎ, জাতীয়-মহা-সভা বা কন্‌গ্রেস্ এবং প্রাদেশিক সমিতি বা কন্‌ফারেনস্—এগুলি স্বেচ্ছাবদ্ধ সমাজ। কিন্তু মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া আমরা যে সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, সে সমাজ এই জাতীয় সমাজ নহে। ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, একটা কল্পিত সামাজিক সর্ত্তের বা সোসিয়াল্ কনট্র্যাক্টের (social contraet) উপরে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, সেই সর্ত্তের উপরেই জনমণ্ডলীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বহুদিন সে কল্পিত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন আর মানবসমাজকে এইরূপ একটা স্বেচ্ছাবদ্ধ ও স্বকৃত মিলনভূমি বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু কখনোই এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দু চিরদিনই এটী জানেন যে মানুষ যেমন আপনার খুসি বা খেয়ালমত এই ভৌতিক দেহ ধারণ করে না, সেইরূপ সে আপনার ইচ্ছামত সমাজ-বিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ব্যাপারই তার প্রাক্তনকর্ম্মবশে সংঘটিত হইয়া থাকে। তার প্রাক্তনকর্ম্মই তাহাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ফল-অনুযায়ী ভৌতিক দেহেতে আবদ্ধ করে। আর সেই প্রাক্তনকর্ম্ম-বশেই মানুষ সমাজ-বিশেষে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সেই সমাজের কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই দেহের সঙ্গে যেমন, তার নিজের সমাজের সঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ আকস্মিক নহে কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। যেখানে সে ঘটনাবশে, পরজীবনে, সমাজান্তর গ্রহণও করে, সেখানেও তার মূল ও জন্মগত সমাজ-প্রকৃতিটীকে সে সঙ্গে লইয়াই যায়। সেই স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত নূতন সমাজে, নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া, কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন্ম হইয়াছিল, সেই সমাজের মূল ছাপটা তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিরাচরণ হইতে কখনোই একেবারে মুছিয়া যায় না। প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার বৈজিকগুণ সংক্রামিত হইয়া, এই স্বেচ্ছাগৃহীত নূতন সমাজেও, চিরদিনের জন্য না হউক, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত, তার বংশধরগণের চিন্তাতে ও চরিত্রে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর ইহাতেই সমাজের সঙ্গে সেই সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ যে আকস্মিক নহে, কিন্তু নিতান্তই অঙ্গাঙ্গী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সঙ্গে সমাজান্তর্গত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা একান্তই অপরিহার্য্য

ও অঙ্গাঙ্গী বলিয়াই, হিন্দু কখনো আপনার সমাজকে নির্জীব মনে করেন নাই। তাঁহার দেহে যেমন একটা প্রাণবস্তু আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, যে সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্ববিধ দৈহিক চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই প্রাণবস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন; তেমনি তাঁহার সমাজেও একটা প্রাণবস্তু আছে, হিন্দু এ কথায় চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। এই সমাজ-প্রাণকেও চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাজপ্রাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। আর হিন্দুর এ সিদ্ধান্তকে য়ুরোপীয়দের পক্ষেও আজিকালি একটা অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মানবসমাজে জীবধর্ম্ম আরোপ করিয়া, তাহাকে নিঃসঙ্কোচে জীব-উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়াল্ অর্গেনিজ্‌ম্ (social organism) বা সমাজ-জীব কথাটা য়ুরোপীয় চিন্তায় সর্ব্বথা গৃহীত হইয়াছে। আর এটা যদি কেবল একটা কথার কথা না হয়, এর পশ্চাতে যদি কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তবে জনসমাজের ভিতরে একটা আত্ম-স্ফুরিত প্রাণন-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জীব বলিলেই তার একটা ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব আছে, এটা বোঝায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব সাধারণ জীবধর্ম্ম। জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যলাভের জন্য যথোপযুক্ত উপায়-নির্ব্বাচন ও সেই উপায়-অবলম্বনে আপনার সফলতালাভের প্রয়াস করিবার একটা আভ্যন্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ব্ববিধ জীবন-চেষ্টার ভিতর দিয়া তার জীবনের এই চরমলক্ষ্যটী নিয়ত ফুটিয়া উঠে। জীবের ভিতরকার ও বাহিরের

বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সর্ব্ববিধ বিধিব্যবস্থা এই লক্ষ্যটীর সন্ধানেই চলে। জন-সমাজেরও সমষ্টিভাবে একটা গতি, একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-চেষ্টা, একটা নিয়ম আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু গতি আছে, তথাপি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য নাই; বিধান আছে, তথাপি কোনো স্থির লক্ষ্য নাই; নিয়ম আছে, তথাপি সে নিয়ম কোন কিছুই স্থিরভাবে আয়ত্ত, প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না,—ইহা কুত্রাপি জীবধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। এরূপ অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু জনসমাজকে কেবল অর্গেনিজম্ বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। জনসমাজে শুদ্ধ জীবত্ব আরোপ করিয়াই, তার প্রকৃতি ও গতির সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। জনসমাজকে, এই জন্য, কেবল অর্গেনিজ্‌ম্ না বলিয়া বিইংই (Being) বলিতে হয়। ইতালীয় মনীষী মহামতি ম্যাট্‌সিনী মানবসমাজকে এই বিইং উপাধি প্রদান করিয়াছেন। য়ুরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে, বোধ হয়, ম্যাট্‌সিনীই মানব-সমাজের মূল প্রকৃতিটী অতি পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছিলেন। Humanity is a Being—আধুনিক যুগে ম্যাটসিনীই প্রথমে অকুতোভয়ে এ কথাটা বলিয়াছেন। আর বিইং (Being) বস্তু অচেতন নহে, সচেতন। তাহা স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। তার আত্মজ্ঞানই তার গতির কারণ ও স্থিতির ভূমি হইয়া আছে। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে বিইং (Being) বলেন, হিন্দু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা যাহাকে "আমি" বলি, যাহাকে অপর মানুষে তুমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তুই আত্মবস্তু। তাহাই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এ বস্তু আপনি আপনার গতি-হেতু ও স্থিতি-ভূমি। হিন্দুর শাস্ত্রে, জীবান্তর্য্যামী এই আত্মবস্তুকেই নারায়ণ বলিয়াছেন। "জীবহৃদে জলে বসে সেই নারায়ণ।" এই নারায়ণই ব্যষ্টিভাবে জীবান্তর্য্যামী—পরমাত্মা। আর এই নারায়ণই, সমষ্টিভাবে,

মহাবিষ্ণুরূপে, সমগ্র মানবসমাজেরও আত্মা। ম্যাট্‌সিনী যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "হিউম্যানিটী ইজ এ বিইং" (Humanity is a Being) এই কথা বলিয়াছেন, সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াই, হিন্দুসাধক মহাবিষ্ণু নাম দিয়াছেন। এই হিউম্যানিটীর ভাব বা আদর্শকে য়ুরোপের নিকট হইতে ধার করিয়া, বিশ্বমানব উপাধি দিয়া নিজেদের জাতীয় সাধনায় বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক। * আমাদের মহাবিষ্ণুতে এই ভাবটী যেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, য়ুরোপের হিউম্যানিটীতে এখনো তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। কোথাও কোথাও খৃষ্টীয়-সাধনায় খৃষ্টেতে বরং এ ভাবটী ফুটিয়াছে। এই মহাবিষ্ণুই বিশ্ব-আত্মা। এই দেহ নারায়ণেরই কায়ব্যূহ। তিনিই হৃষীকেশ,—এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের অন্তরস্থ পর-আত্মা বা পরমাত্মা,—বিজ্ঞান-চৈতন্যের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই কর্ম্মাধিপ,—দেহমনের সর্ব্ববিধ চেষ্টার নিয়ামক ও ফলদাতা। আবার সমষ্টিভাবে, মহাবিষ্ণুরূপে, এই নারায়ণই সমাজ-দেহে বাস করিতেছেন। জনসমাজ এই মহাবিষ্ণুরই কায়ব্যূহ-স্বরূপ। তিনিই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ সমাজ-নিয়মের একমাত্র নিয়ন্তা। সমাজ-বিবর্ত্তনের তিনিই একমাত্র প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। ম্যাট্‌সিনী যে হিউম্যানিটীকে বিইং বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বই বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু। আর আপনার সমাজকে হিন্দু এই সর্ব্বান্তর্য্যামী, এই সমাজান্তর্য্যামী, এই বিশ্ব-আত্মা

* বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সময়ে মাকে মহাবিষ্ণুর অঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই মা'র নিত্যমূর্ত্তি। মহাবিষ্ণুর অঙ্ক হইতেই মা ক্রমে জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা রূপে সমাজ-বিবর্ত্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবিষ্ণুই য়ুরোপীয়দিগের হিউম্যানিটী।

মহাবিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশ ও কায়ব্যূহরূপে দেখেন বলিয়াই, তাঁহার নিকটে সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হইয়াছে।

হিন্দুসমাজতত্ত্বে গতি-শক্তির স্থান

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু যে কখনো আপনার সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হন না, এবং এই সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবার সময় প্রচলিত সমাজ-বিধির আনুগত্য অস্বীকার করেন না, এমনো নয়। হিন্দুর চক্ষে সমাজটা দেহমাত্র, নারায়ণই এ দেহের প্রাণ। আর প্রাণের প্রয়োজনেই দেহ; দেহের প্রয়োজনে তো প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও, সর্ব্বদাই দেহ অপেক্ষা বড় হইয়া রহে। নারায়ণ সর্ব্বদাই সমাজ হইতে বড়। আর সমাজের রীতিনীতি যখন কালবশে নারায়ণের আত্মপ্রকাশের অনুপযোগী হইয়া, তাঁর আত্মপ্রয়োজনেই, পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি স্বয়ং সাধুমহাজনগণেতে আবিষ্ট বা অবতীর্ণ হইয়া, এই সকল পরিবর্ত্তনযোগ্য বিধিব্যবস্থা রহিত করিয়া, নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসঙ্কোচে এই মহাজনপন্থার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, প্রচলিত ও পুরাপ্রতিষ্ঠিত পরিবর্ত্তনযোগ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পুরাতন আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে যেখানে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়, যেখানে এই সংস্কারচেষ্টা শুদ্ধ সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কারের নামে, তখন সমাজের জনগণমধ্যে অসংযত ব্যক্তি-ত্বাভিমান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব-স্ব-প্রধান করিয়া, সমাজ-শাসনকে শিথিল করিয়া দেয় না। সেখানে প্রাকৃতজনের অশোধিত বিচারবুদ্ধি ও অসংযত ভোগলালসার দ্বারাই প্রচলিত রীতিনীতির

পরিবর্ত্তনযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় না এবং প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বশ্যতা অস্বীকার করিতে যাইয়া, সমাজসংস্কারচেষ্টা সমাজমধ্যে অরাজকতা আনয়ন করিতে পারে না। যুগে যুগে, এই ভাবেই হিন্দু-সমাজের সংস্কার ও বিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। মহাজনপন্থার অনুসরণ করিয়াই হিন্দু সর্ব্বদা আপনার সমাজের সংস্কার ও শোধন করিয়াছেন। আর এই কারণেই, প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়াও, হিন্দু প্রকৃতপক্ষে কখনো সর্ব্বধর্ম্মমূল যে সমাজানুগত্য তাহাকে একান্ত-ভাবে বর্জ্জন করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও কদাপি হিন্দুসমাজে উপস্থিত হয় নাই।

মহাজন-পন্থার প্রণালী

কিন্তু কোনো সমাজের সকল লোকই সর্ব্বদা সেই সমাজের মূল প্রকৃতিকে সজ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে না। সকলেই তার শ্রেষ্ঠতম বিধান বা উৎকৃষ্টতম আদর্শানুযায়ী আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়া তোলে না। এই জন্য কালবশে যুগে যুগে যখনি সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, তখন সকল হিন্দুই যে এই মহাজনপন্থা আশ্রয় করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। আর কোনো যুগেই যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনেরা সেই যুগের প্রারম্ভেই আবির্ভূতও হন না। প্রথমে নানা কারণে সমাজ-মধ্যে নূতন আদর্শ ও নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। তখন অল্পে অল্পে নূতনে ও পুরাতনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া, সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে। আর তখন হইতেই এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়োজনও আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলার একান্ত আতিশয্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা আবির্ভূত হন

না। কারণ ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ না করিলে, যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলেই, এক দল লোকে মহাজনপদাশ্রয় লাভ না করিয়াও, শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতেই সমাজের প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সে সময়ে আর একদল লোক সমাজস্থিতিরক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকেই আশ্রয় করিয়া রহেন। কিন্তু যথাসময়ে মহাজনেরা আবির্ভূত হইলেই যে সকলে বা অনেকে একযোগে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করেন, তাহাও নহে। তখনো একদল লোকে প্রাচীনকেই ধরিয়া রহেন। হিন্দুসমাজের বিবর্ত্তন-ইতিহাসেও এটী সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আর্য্যগণ সকলেই বা অধিকাংশই তাঁহার শরণাপন্ন হন নাই। কেহ কেহ যেমন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ কেহ আত্যন্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার প্রতিরোধও করিয়াছিলেন। আর বহুসংখ্যক লোকই তাঁহার আনুগত্যও গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতিপক্ষতাও করেন নাই, কেবল যাহা ছিল, তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে, আমাদের এই বাঙ্গলাদেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে। আর আমাদের এ কালেও যে যুগভাবপ্রবর্ত্তক মহাজনের আবির্ভাব হয় নাই, এমনো তো নয়। কিন্তু সকলেই কি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বা করিতে পারিয়াছেন?

ফলতঃ এরূপ সর্ব্বদাই হইয়াছে ও সর্ব্বদাই হইবে। কারণ, সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়। কারো প্রকৃতি বা তামসিক, কারো বা রাজসিক, আর কারো বা শুদ্ধ সাত্ত্বিক। যাঁরা নিতান্ত তামসিক, তাঁরা এ মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁদের অবিবেক, তাঁদের

জড়তা, তাঁদের ভয়প্রমাদাদি এ পথে চলিবার একান্ত অন্তরায় হইয়া রহে। সেইরূপ যাঁরা নিতান্তই সাত্ত্বিক, যাঁহাদের তমঃ ও রজঃ উভয়ই অন্তরস্থ সত্ত্বগুণের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই সকল সহজসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি ভক্তিমান হইয়াও, প্রয়োজনাভাবে, প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাদের ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের কর্ম্মস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন না। যাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি রজোপ্রধান, তাঁহারাই প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের প্রবুদ্ধগতি-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা অন্বেষণ করেন। আর ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অন্তরস্থ রজোগুণ বর্দ্ধীয়মান সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে আরম্ভ করে, তাঁহারাই যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন। কারণ, যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ আপনারা ত্রিগুণাতীত হইলেও, চতুঃপার্শ্বস্থ রজোগুণপ্রধান লোকদিগকে অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রথম শিষ্যেরা সকলে না হউন, অনেকেই, রজোপ্রভাবে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত সংস্কার ও পন্থাকে পরিহার করিয়া, নূতন সাধন ও শাসন গ্রহণ করেন। ক্রমে এই নূতন সাধন ও শাসনের ফলেই, তাঁহাদের অন্তরস্থ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে তাঁহাদের রজোগুণকে অভিভূত করে, পরে, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা ক্রমে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ভাগবতী তনু লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিণামে সত্ত্বাধিক্য হইলেও, আদিতে, নূতন পন্থা অবলম্বন সময়ে, রজোগুণের আতিশয্য থাকা একান্তই আবশ্যক হয়। নতুবা সকলে যুগপ্রবর্ত্তকমহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারে না। আর এই কারণেই হিন্দুর যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। কেবল এক পরশুরামই,

অবতারগণমধ্যে, ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন মাত্র; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। পরন্তু ত্রিভুবনকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্যই তাঁহাকে রজঃপ্রধানা রাগাত্মিকা ক্ষত্রিয়প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। হিন্দুর কিম্বদন্তিপ্রসিদ্ধ যুগাবতারগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পশ্চাতে সমাজবিজ্ঞানের একটা অতি সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গুরুদাসবাবু ও মহাজনপন্থা

গুরুদাস বাবুর মধ্যে কখনো এই রজোগুণের কোনো প্রকারের আতিশয্য দেখা যায় নাই। "কর্ম্মনাং অশমঃ স্পৃহা"—ইহাই রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ "তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং।" ইহা "রাগাত্মিকা।" গুরুদাস বাবুর কর্ম্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্য্যন্তও জনহিতকর কর্ম্মে তাঁর বিন্দু পরিমাণ আলস্য বা ঔদাসীন্য দেখা যায় না। কিন্তু কর্ম্মচেষ্টা থাকিলেও কখনোই কর্ম্মে তাঁর অশম স্পৃহা দেখা যায় নাই। তাঁর কর্ম্মচেষ্টা তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভব নহে, ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত। সুতরাং আমাদের অপরাপর কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে প্রায়শঃই যে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব ও ফলাফল-সন্ধিৎসু চাঞ্চল্য লুকাইয়া থাকে, গুরুদাস বাবুতে তাহা লক্ষিত হয় নাই। আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এই রজোগুণের আতিশয্য নাই বলিয়াই, যে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দু-সমাজের বিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ প্রত্যেক যুগসন্ধিসময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির মধ্যে এমন সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, গুরুদাস বাবু, আপনার কর্ম্মজীবনে বা ধর্ম্মজীবনে, কোথাও একান্তভাবে সেই মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গুরুদাস বাবুর ভিতরকার প্রকৃতিই

এমন যে তিনি বৌদ্ধযুগের আদিতে জন্মিলে, কখনই একান্তভাবে ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্নও হইতে পারিতেন না, তাঁর প্রতিবাদীও হইতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি অন্তরে ভক্তিমান হইয়াও, সেকালের ক্রিয়াবহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৈদিক পন্থাকেই ধরিয়া রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও, গুরুদাস বাবু তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও কায়স্থদিগের ন্যায় গুরুদাস বাবুও হয় ত মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনই তাঁর একান্ত অনুগত হইয়া, সমাজের প্রচলিত স্মৃতি-আনুগত্য বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। আর আমাদের এই কালে, বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের গতিশক্তি যে সকল মহাজনকে আশ্রয় করিয়া, সমাজের "পরিবর্ত্তনযোগ্য" রীতিনীতির সংস্কার-সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে, গুরুদাস বাবু ইঁহাদের সকলেরি প্রতি ভক্তিমান, কাহাকেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন না; কিন্তু আবার কাহাকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া, সমাজের পরিবর্ত্তনযোগ্য রীতিনীতির আনুগত্যও পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হন নাই।

গুরুদাস বাবু ও লৌকিকাচার

মোটা কথা এই যে—

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

"যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষম হইলেও, কদাপি আপনার মনেও লৌকিকাচারকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না"—ইহাই গুরুদাস বাবুর কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র হইয়া আছে। গুরুদাস বাবু, মোটের উপরে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতিরই পরিবর্ত্তন যে

আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা জানেন ও মানেন। আর এ সকল মত প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যতদিন না সমাজ সমষ্টি-ভাবে এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না এগুলি লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এদেশের হিন্দুসমাজে যে অতি অল্পবয়সে বালক-বালিকাদের বিবাহ হইত, গুরুদাস বাবু তার প্রতিবাদী। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষেই সচরাচর "স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর-সংসর্গলিপ্সার" উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে এই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তখনই তাহাকে "নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ন্যস্ত করিয়া নিবৃত্তিমুখী করিবার জন্য" নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য—বিবাহের বয়সসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। * কিন্তু কার্য্যতঃ বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্তই তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিচার মতে চতুর্দ্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম কাল নির্দ্ধারিত হওয়াই বিধেয়। "অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত্ত" নর-নারীর পক্ষে আরো অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও, ধর্ম্মহানি হয় না, এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তথাপি কেবল লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়াই, গুরুদাস বাবু, দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষই বালিকার বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের লৌকিকাচারে যদি অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের বিবাহ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, গুরুদাস বাবু যে তখনো এই দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিয়মকেই ধরিয়া থাকিবেন, এমন

---

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—২৮৪ পৃষ্ঠা

বোধ হয় না। যেমন বাল্যবিবাহের সংস্কারসম্বন্ধে, সেইরূপ হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতি-বিচারসম্বন্ধেও, লোকাচারে যে পরিমাণে শিথিলতা বা ঔদার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, গুরুদাস বাবু কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। পরমার্থদৃষ্টিতে যে জাতি-বিচারের স্থান নাই, গুরুদাস বাবু ইহা স্বীকার করেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
গাভী হস্তী কুক্কুরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।
পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে॥

এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।" * গীতার এই উক্তি অনুসারে, আর গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারাই প্রথমে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া, হিন্দুসমাজে এখন যে আকারে জাতিবিচার প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্গত বলিয়া তাহার সমর্থন করা সম্ভব নহে; গুরুদাস বাবু ইহা জানেন। কিন্তু সমাজের লোকমত এখনো এতটা অগ্রসর হয় নাই। তবে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে আজিকালি জাতিবিচারটা কেবল পানাহার ও বিবাহেতেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং মধ্য যুগের হিন্দুয়ানীর "লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—এই আদেশ মনে রাখিয়াই যেন, গুরুদাস বাবুও "আহার ও বিবাহ বাদ দিয়া" অন্যান্য বিষয়ে জাতির প্রাচীর যে ভাঙ্গা যাইতে পারে, ভাঙ্গাই যে কর্ত্তব্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আর যে যুক্তি অবলম্বনে † বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়েই এখন জাতিবিচার মানিয়া চলা কর্ত্তব্য, অন্য বিষয়ে নহে,

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—৩৫৪ পৃষ্ঠা।

† জ্ঞান ও কর্ম্ম—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও লৌকিকাচারই যে তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ একমাত্র তৌলদণ্ড, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গুরুদাস বাবুর সামাজিক সিদ্ধান্ত

আর গুরুদাস বাবুর মতন এমন সম্যক্‌দর্শী, এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদ্বিচারক মনীষীর সিদ্ধান্তেও সামান্য লৌকিকাচার যে এতটাই অদ্ভুত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও একান্ত কঠিন নহে। প্রথমতঃ গুরুদাস বাবু আযৌবনকাল আইনকানুন লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শাস্ত্রেই লোকাচার অদ্ভুত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যে সকল লোকাচারের আরম্ভকাল জনগণের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সকল সভ্যসমাজেই সে জাতীয় লৌকিকাচারকে প্রত্যক্ষ আইনের সুস্পষ্ট বিধানের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বিবাহ, দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক স্বত্বাস্বত্ব নির্দ্ধারণে, এইরূপ লৌকিকাচার শ্রুতি-স্মৃতি অপেক্ষাও বলবত্তর বলিয়া গণ্য হয়। আর ব্যবহার শাস্ত্রে লৌকিকাচারের এতটা অদ্ভুত প্রভুত্ব দেখিয়াই, ব্যবহারজীবী গুরুদাস বাবুর প্রাণে তাহার প্রতি এমন অপরিসীম মর্য্যাদা জন্মিয়াছে। গুরুদাস বাবু ব্যবহারবিদ্ (jurist) ও নীতিবিদ্ (moralist) দু'ই। কেবল ব্যবহারবিদ্ বলিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তাঁর সাধনায় ও সিদ্ধান্তে বাবহারবিদের দিক্‌টা যে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক নীতিবিদের দিক্‌টা সে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। গুরুদাস বাবু জীবনের গুরুতর সমস্যাসকলকে কতটা পরিমাণে যে সমীচিন ব্যবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও সর্ব্বদা ব্যবহার তত্ত্বের যুক্তিপ্রণালীর

অবলম্বনে এ সকলের যথোপযোগী মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন তাঁর ব্যবসায়ের দীর্ঘ অভ্যাস অন্যদিকে সেইরূপ তাঁর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তও গুরুদাস বাবুর এই লোকাচারানুগত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তত্ত্বসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু শঙ্কর-বেদান্তাবলম্বী। শঙ্কর-বেদান্ত মতে, বিশেষতঃ যে মায়াবাদ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত বলিয়া এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে, জীব ও জগতের সত্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, এই জীব ও জগতের পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান পরমার্থতঃ মিথ্যা। মায়াতেই এই সংসারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধসকলের কোনো নিত্যলক্ষ্য বা পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সমাজ-ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি, সকলই অতি নিচের কথা; সাধনার্থীর নিকটে ইহার মূল্য থাকিলেও, সিদ্ধ পুরুষের নিকটে কোনো সত্য, কোনো মূল্যই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির ব্যবহারিক সত্য ও সার্থকতা আছে মাত্র; পারমার্থিক সত্য ও সার্থকতা নাই। অতএব দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, উপরতি, তিতিক্ষা, এ সকল সাধনসম্পৎলাভের জন্য উপযোগী অভ্যাসের ক্ষেত্র বলিয়াই সংসার প্রয়োজনীয়। সাধনসম্পৎ লাভ হইয়া ক্রমে বিবেক-বৈরাগ্যাদি ও সর্ব্বশেষে ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হইলে, সর্পের খোলস যেমন আপনা হইতেই, অনাবশ্যক বলিয়া, তাহার গাত্র হইতে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধাদিও তাহার মন হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু কেবল মায়াবাদীর নিকটেই যে সংসারের সম্বন্ধসকল অনিত্য, ও অনিত্য বলিয়াই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক, তাহা নহে। কোনো হিন্দুসিদ্ধান্তেই এ সকলের অনিত্যতা অস্বীকৃত হয় নাই। যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরাও এগুলিকে নিত্য বা

সত্য বলেন না। সুতরাং এ সকল ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের অতীত হইবার চেষ্টা সকল সাধনেই আছে। তবে মায়াবাদী এ সকলের পশ্চাতে কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন না। আর যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরা সংসারের সর্ব্ববিধ অনিত্য সম্বন্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থায়ী রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকল রসকে রস-স্বরূপ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই নিখিল-রসামৃতসিন্ধুর উপরিস্থ তরঙ্গভঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। এ সংসারে পিতা-পুত্রের যে কায়িক সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষতঃই অনিত্য। প্রাকৃতজনে যে বাৎসল্যরস আস্বাদন করে তাহাও অস্থায়ী, সন্তানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি হয়, আর সন্তান গত হইবার পরে সচরাচর তাহা ক্ষীণ হইয়া, দীর্ঘকাল পরে, লুপ্তপ্রায় হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধের পশ্চাতে একটা স্থায়ী বাৎসল্যরস আছে। এই স্থায়ী রসই, দেশকালাধীন এই সংসারে লৌকিক পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার যে সম্বন্ধ, তাহারই মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ রস ভগবৎ-প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পারমার্থিক ও নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই স্থায়ী ভাগবতীলীলা-রসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্বন্ধের অন্তরালে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ স্থায়ী রস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই জন্য, এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন বলিয়া, সংসারেরও একটা পারমার্থিক সত্য ও মাহাত্ম্য, মর্য্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও সংসার অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্যও নহে; কিন্তু নিত্যানিত্য-মিশ্রিত। ইহাকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী নিত্য বলিয়াই, এই সংসার ভাগবতী-লীলার আশ্রয় হইয়া আছে। এই লীলা-প্রয়োজনেই মনুষ্যসমাজ মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের কায়ব্যূহ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের আত্মচরিতার্থতার জন্যই, সেই অদ্বৈত-স্বরূপেরই মধ্যে, যে একটা দ্বৈত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত-সম্বন্ধ বা ভেদাভেদকে অবলম্বন

করিয়াই ভগবান নিত্যলীলাপর হইয়া আছেন, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে এই তত্ত্বের কোনোই স্থান ও সঙ্গতি নাই। সুতরাং ভগবল্লীলারসপর বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যে ভাবে ও যে অর্থে মহাজনপন্থা আশ্রয় করিয়া, সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। এখানে লৌকিকাচারের পন্থা অবলম্বন করিয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের স্বাভাবিক বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহার আর অন্যপথ নাই।

সংসার মায়ামাত্র। সমাজসম্বন্ধ সকল মায়িক। মানুষের স্নেহমমতা, প্রেয়-ও-শ্রেয়বোধ, ভালমন্দজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার, সকলই অবিদ্যাবদ্বিষয়ানী। সুতরাং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কার্য্যের যে একটা সঙ্গতি রাখিতেই হইবে, এখানে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের এ সকল মতামত যখন মিথ্যা, কার্য্যাকার্য্য যখন মিথ্যা, মতের সঙ্গে কার্য্যের মিলন-বিরোধও যখন মিথ্যা; তখন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজের মিল হইল কি না হইল, তাহাও মিথ্যা। এ সকলের ব্যবহারিক সত্য থাকিলেও পারমার্থিক মর্য্যাদা নাই। এ সকল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক। প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সংসারধর্ম্মের কোনই পারমার্থিক সত্য ও মর্য্যাদা নাই। চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব্ববিধ দ্বৈতবোধ নষ্ট করাই, শঙ্কর-বেদান্তমতে, সমাজধর্ম্ম ও সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। সমাজবন্ধন ও সামাজিক সম্বন্ধ সকল জীবের বহির্মুখীনও বহুমুখী প্রবৃত্তি সকলকে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিয়া দিয়াই, এই পারমার্থিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে। আর একমাত্র সংযম ও নিবৃত্তিসাধনই যখন সমাজধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তখন লৌকিকাচারের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যে কোনো উদ্দেশ্যে ও যে কোনো আকারেই সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহাতেই সমাজবন্ধনের এই

মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলেই কোনো না কোনো আকারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হয়। এরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের পক্ষে আপনার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখা একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে। আর সর্ব্ববিধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যেই যে কলহবিরোধ জাগিয়া থাকে, তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিবার সাহায্য করে না। সুতরাং লৌকিকাচারকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য শঙ্করমতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীসমাজে একদিকে প্রচণ্ড জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপন্থার প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব, অন্যদিকে তামসপ্রকৃতিসুলভ নিশ্চেষ্টতা ও লৌকিকাচারের আত্যন্তিক আনুগত্য, এ দুই দেখা গিয়া থাকে। একদিকে—বিচারে, চিন্তায়, সাধনায় ও সিদ্ধান্তে—এ সকলে সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়াও, কার্য্যকালে ইহাঁরা প্রায় সর্ব্বদাই সমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকারের ভেদ ও বৈষম্যের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবার জন্য ব্যগ্র হন। শঙ্কর স্বয়ংও ইহার অন্যথাচরণ করেন নাই। মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী লৌকিকাচারকে যে এমন করিয়া ধর্ম্মের আসনে বসাইতে চাহিয়াছে, শঙ্কর-বেদান্তের সঙ্গে ইহার অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আর আজিও হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়মধ্যেই শঙ্কর-সিদ্ধান্তের প্রভাব, প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে বলিয়াই, আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও লৌকিকাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে এত ভয় পাইয়া থাকেন। গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্যের অন্তরালেও শঙ্কর-বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে।

লৌকিকাচারকে কেবল মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীই যে ধর্ম্মের আসনে

বসাইয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান কালে কোনো কোনো য়ুরোপীয় সিদ্ধান্তেও তার প্রায় অনুরূপ মর্য্যাদাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টাদশ খৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা, অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়াও সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিপ্রতিষ্ঠ মরালিটীর বা ধর্ম্ম-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ লৌকিকাচারকেই ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী কোমত্‌-সিদ্ধান্তেও আমাদেরই শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায়, সমাজ-বিবর্ত্তনে সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য, এই লৌকিকাচারই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোমত্‌সিদ্ধান্ত-বাদিগণ, ইংরেজিতে যাঁহাদিগকে পজিটিভিষ্ট্‌ (Positivist) সম্প্রদায় বলে,—একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতির জন্য লালায়িত, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজের স্থিতিভঙ্গ-নিবারণের জন্যও একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁরা কিছুতেই, কার্য্যতঃ, সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রভাব নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের নিকটেও সমাজই ধর্ম্মের কায়ব্যূহস্বরূপ। ক্যাথলিক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে চার্চ্চ বা রোমক-খৃষ্টীয় সঙ্ঘ যে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যেরূপ এই চার্চ্চের বা সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলে, প্রত্যক্ষবাদী কোমত্‌মতাবলম্বিগণ মধ্যে সমাজ সেইরূপ মর্য্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের আনুগত্য মানিয়া চলা, কোমত্‌মতে নিতান্তই নীতিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোমত্‌মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এই সমাজানুগত্য বা লৌকিকা-চারানুগত্যের একটা যে ঐক্য আছে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁরা কোমত্‌মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষায় ও চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের জমিদার, স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ন্যাশন পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইহাঁরা দু’জনেই

কোমত্‌মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা সকলেই জানেন। আর এঁরা দু'জনই একদিকে ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী হইয়াও হিন্দু-সমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজ কোমত্‌বাদিগণ মধ্যে স্যার হেনরী কটন্ প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দুর এই লৌকিকাচারের আনুগত্যকে কখনই ভাঙ্গিয়া দিতে চান নাই; বরং সর্ব্বদাই তাহাকে সঙ্গত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁরা পারলৌকিক ধর্ম্মের দিক্ দিয়া হিন্দু রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সে ধর্ম্মে তাঁদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। কেবল শুদ্ধ সমাজের কল্যাণকামনায়, সমাজস্থিতিরক্ষার্থে, সমাজনীতি বা মরালিটীর দিক্ দিয়াই এ সকলের সমর্থন করিতেন। গুরুদাস বাবু কোমত্‌মতাবলম্বী নহেন। কিন্তু সমাজনীতিসম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্য যে কোমত্‌মতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, আধুনিক য়ুরোপীয় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একটা সঙ্গতিসাধনে যে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তারই জন্য গুরুদাস বাবুর আধুনিক শিক্ষা এবং সাধনাও তাঁর চরিত্রগত মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর ঐকান্তিক লৌকিকাচারানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

গুরুদাস বাবুর এই রক্ষণশীলতার আরো একটী বিশেষ কারণ আছে। গুরুদাস বাবু একদিকে য়ুরোপের আধুনিক সাধনা ও অন্যদিকে স্বদেশের সনাতন সাধনার উভয়েরই মূল প্রকৃতিটী ভাল করিয়াই ধরিয়াছেন। এই দুই সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য আছে, ইহাও তিনি জানেন। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক সমাজের

ধর্ম্মও যে সর্ব্বদাই তার ভিতরকার মূল প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্য কি ব্যক্তির পক্ষে কি সমাজের পক্ষে, সকলেরই পক্ষে যে পরধর্ম্ম ভয়াবহ হয়, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। আমাদের সমাজসংস্কারপ্রয়াস যে অনেক বিষয়েই ভারতের প্রাচীন সমাজপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, য়ুরোপের রীতিনীতির স্বল্পবিস্তর অনুকরণচেষ্টায় চলিয়াছে, ইহাও তিনি দেখিতেছেন। য়ুরোপ যে পথে যাইয়া, অসংযত বিষয়-ভোগলালসায় বিক্ষিপ্ত হইয়া, আপনার জীবনসমস্যাকে বিষম জটিল করিয়া তুলিতেছে, নূতন নূতন পন্থার অনুসরণ করিয়া, সমাজের বুকে সমস্যার উপরে সমস্যাই স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে, একটীরও সমীচিন মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, কখনো পারিবে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই; গুরুদাস বাবু এ সকলই জানেন। আর আমরা যে সমাজের হিতেচ্ছু হইয়া, এ সকল না বুঝিয়া, সংস্কারের নামে, অনেক সময়, নিজেদের সমাজের উপরে এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝা চাপাইয়া দিতেছি, ইহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর এই জন্যই অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত পন্থায় সমাজকে চালাইবার পূর্ব্বে, সে পথ সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুযায়ী হইবে কি না, ইহা দেখিবার জন্যই, তিনি সর্ব্বদা এই লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ই সর্ব্বদা আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আধুনিক জীবতত্ত্বে বা বায়লজিতে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কহে। এই নিয়মাধীন হইয়াই, সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থারও বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কদাপি যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু যেখানেই ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ পরধর্ম্মবশে আত্মহারা হইয়া, বিপ্লবমুখী ও বিনাশোন্মুখ হইয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর

রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিপ্লবের ভয়ই জাগিয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহাঁরা অনেকেই প্রাচীন সমাজের জীর্ণদেহকে রক্ষা করিবার জন্য যত ব্যস্ত, তার ভিতরকার সনাতন প্রাণবস্তুকে রাখিবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। হিন্দুয়ানীর বাহ্য ঠাটটা বজায় থাকিলেই, হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাটের ভিতরকার প্রাণটা হিন্দু কি অহিন্দু, ভারতীয় কি বিলাতী হইয়া যাই-তেছে এ চিন্তা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। এক গুরুদাস বাবুই বোধ হয়, আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে, হিন্দুর সনাতন প্রাণবস্তুকে অক্ষত ও অক্ষয় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। আর এই ব্যগ্রতার জন্যই হিন্দুসমাজের সনাতন প্রাণবস্তু এবং ধর্ম্মবস্তুও, আজ তাঁহাকে ও তাঁহারই মতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠ, সংযত ও সম্যক্‌দর্শী সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, আসন্ন বিপ্লবমুখে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুরই স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা অতি নিগূঢ় ভাবে, চক্ষের অন্তরালে, বসিয়া থাকে। তাহার গতির কারণ যাহা তাহাই বাহিরে ফুটিয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর মত লোকনায়কগণ সমাজের স্থিতির সহায় বলিয়া, তাঁহাদের প্রভাব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না; নতুবা তাঁহাদের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে সামান্য, তাহা নহে। ইহাঁরা আছেন বলিয়াই হিন্দুর সমাজের সমাজত্ব, ও হিন্দুর ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বটুকু এখনো আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতা

আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্য্যন্ত হয় না কেন?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্যসেবক থাকে, উপাধ্যায়ের সেরূপ শিষ্য-সেবক কেহ ছিল না। সে আকাঙ্ক্ষাও উপাধ্যায়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অন্য ধরণের ছিল। গীতা যাহাকে সর্ব্বকর্ম্মন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতির সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বুজুরগী লুকাইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাণটা অতি বড় হইলেও, কোনও মতেই তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে "বুজুর্‌গ্" বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। এমন কি আপনি সংসার করেন নাই বলিয়া, সংসারী লোকের প্রতি তাঁহাকে কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি নাই।

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোনও প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতিসাধন কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোনও কোনও বিষয়ে একান্তভাবেই লৌকিকাচারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইঁহাদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসিগণ লোকসংগ্রহার্থে, কর্ম্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ যাহাতে না জন্মায়, তারই জন্য, লৌকিকাচারের অনুবর্ত্তিতা করিয়া চলেন। উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোনও লোক-সংগ্রহেচ্ছা কখনই দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশভক্তির উপরেই এই অদ্ভুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আর ইহাই উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। উপাধ্যায় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশ-প্রেম অতি হাল্‌কা বস্তু। আমরা এ পর্য্যন্ত গোটা দেশটাকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপ ভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল লাগে, তাহাকেই ভাল-বাসি ; আর যেটুকু ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদেরে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম এ নহে। ভাল-ও-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের পাত্র প্রেমিকের চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে এ ভালমন্দ-মিশ্রিত বস্তুর বা ব্যক্তির ভালকেও ভাল করিয়া বোঝে না; মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছুই নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না; বেশী দেখে। আর বেশী দেখে বলিয়াই প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়াই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না।

উপাধ্যায় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাঁর নিকটে স্বদেশ-বস্তু যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে। অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে চক্ষে স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না। অথচ উপাধ্যায় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, বা যেটী যেমন আছে, সেটী ঠিক তেমনি থাকুক, ইহা যে তিনি চাহিতেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজ যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয় না, তাহা মৃত, জড়; তার ভূতগৌরব যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ-আশা যে কিছুই নাই, আমরা যেমন ইহা বুঝি, উপাধ্যায়ও ঠিক সেইরূপই বুঝিতেন। তাঁহাকে প্রকৃত অর্থে কিছুতেই "রি-অ্যাকষণারী" (Re-actionary) বলা সঙ্গত হইত না। অথচ, অন্যপক্ষে তিনি যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা Reformer ছিলেন, তাহাও নহে।

কারণ তিনি স্বদেশকে যে ভাবে, যতটা ভাল বাসিতেন ও ভক্তি

করিতেন, কোনও সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় না। সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, আর যৌবন-কালের চারিপাশের বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কারক সমাজের দোষভাগের প্রতি যতটা সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা সজাগ থাকিতেই পারেন না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগটা কমিয়া যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচনা করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে সে ব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য ভালবাসা লাভ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভালবাসা সুন্দরের সাক্ষাৎকারেই জন্মে, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধানেই ফিরে। কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে বা চিন্তনে, ভালবাসা জন্মিতেই পারে না, বাড়িয়া ওঠা বা বাঁচিয়া থাকা তো বহু দূরের কথা। অথচ সমাজসংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতস্থানগুলির চারিদিকেই সর্ব্বদা ভন ভন করিয়া বেড়ান; এরূপ না করিলে তাঁর ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারক অনেক সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত, ও মদান্বিত হইয়া উঠেন। আর এ অবস্থায় ইঁহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় সমাজসংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁর পরিণত বয়সের দীর্ঘ-সাধনলব্ধ বস্তু; যৌবনের পরকীয়া প্রীতির মোহের মরীচিকা মাত্র নহে। তাঁরই জন্য এ বস্তু এতটা সাচ্চা ও সজীব হইয়াছিল।

উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের সৌন্দর্য্য, আমাদের কদর্য্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্ব্বলতার মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিতেছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্যই আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এ বিষয়ে তিনি ভারতে সন্ত-সমাজ-সুলভ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি আছে তাহা তত দেখেন না, সে সত্য বস্তুটা যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি বা পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ দু'দিনের কর্ম্মভোগ দু'দিনে ফুরাইয়া যাইবে। পথের ধূলামাটী চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের প্রেমের বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পতা হয় না। উপাধ্যায়ও সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কি ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দৃক্পাত করিতেন না। ভারতবর্ষ সত্য বস্তুটী কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্ত্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তাঁর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে দুদিনের, এ মায়া যে

ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দ্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে ;—এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও লোক-প্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আর এই খানেই আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্ব্বযুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে যে প্যাট্রিয়টিজম্ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শক্তিসাধ্যের উপরে এই অবিচলিত আস্থা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ বস্তু আমাদের সে'কালের সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যেও ছিল না, রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্যই প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয়-কর্ম্মচেষ্টা, উভয়ই একান্ত বহির্ম্মুখীন ও বিদেশাভিমুখীন ছিল। সুতরাং সে সময়ে আমরা আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মচেষ্টা, রাষ্ট্রীয়-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ,—স্বাদেশিকতার সকল উপকরণগুলিকেই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তৌল করিতে যাইতাম।

আর পরের মাপে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এরূপভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভবে না। এই কারণে আমাদের প্রথমযুগের সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকলপ্রকারের স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে একটা গুরুতর আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি হইতে একটা পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস

জন্মিয়া গিয়া, আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালনকেই আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও নূতন কারণ করিয়া তুলে।

প্রচলিত সমাজসংস্কার-চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, উপাধ্যায় এই উভয়বিধ কর্ম্ম-চেষ্টারই তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ব্ববিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াও এই সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা, সে শক্তিকে সংহত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বরং প্রজা-সাধারণের নিজের হাতে আত্মচেষ্টাতে কোনও স্বাদেশিক কর্ম্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে নষ্ট করিয়াই ফেলিতেছিল। এই জন্য উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের দিকে একান্ত-ভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত ভাবে আমরা জনশক্তির সংহতিতে সর্ব্ববিধ স্বাদেশিক কার্য্য সাধন করিব,—উপাধ্যায় সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বাঁধানই প্রথমাবধি যে তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে, ঘটনাচক্রে, এরূপ একটা বিরোধের সূত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় নিজে ইচ্ছা করিয়া জাগাইয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। ফলতঃ দেশের তদানীন্তন অবস্থাধীনে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বাদেশিক কর্ম্ম করা নীতিসম্মত না হইলেও, চিরদিনই যে জন-মণ্ডলীর পক্ষে এরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বা

সম্ভব, উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণা প্রদান করা আবশ্যক হয়। এই জন্যই উপাধ্যায় জীবনের শেষ দশায় এই স্বাতন্ত্র্য-নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজসিকতা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার চিরন্তন বা উর্দ্ধতন লক্ষ্য যে নয়, উপাধ্যায় ইহা যেমন জানিতেন, এমন আর কেহ জানিতেন বলিয়াই বোধ হয় না। তবে যে সাত্ত্বিকতা চিরদিনই আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে, সেই সাত্ত্বিকতাকে জাগাইতে হইলেই, সে অবস্থায়, প্রথমে দেশব্যাপী তামসিকতাকে রাজসিকতার দ্বারা অভিভূত করা আবশ্যক, উপাধ্যায় এ সত্যটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয়া তোলা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে ভবিষ্যতের সাত্ত্বিকতার পথও উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক অরাজকতার প্রতিষ্ঠারও কোন বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। এই জন্যই উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অভিনব স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা, তাহাদিগের চক্ষুকে আপনার উপরে নিবদ্ধ করা, নিজের হাতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংযম, যে শক্তি লাভ হয়, ইহাতে আপনাদের উপরে যে আস্থা জন্মে, ও এই আস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, পেশিতে যে বল সঞ্চারিত হয়, এই সকলের জন্যই উপাধ্যায় এই নীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, নতুবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাঁধানই যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না।

কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শটীকে ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-নীতির আলোচনা করা

আবশ্যক। কারণ এখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার নিজস্ব স্বরূপটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্বদেশবস্তুকে কতটা যে ভাল বাসিতেন, তাঁর ঐকান্তিক সমাজানুগত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সাধনা পরিহার করিয়া, সাধনান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধর্ম্মসাধনকেই, আপনার জীবনে, সম্পূর্ণরূপে, নিজের দেশের সমাজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে কেবল একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণশীলতাই দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁর পরিণত বয়সের এই সমাজানুগত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তাঁর পূর্ব্বকার ধর্ম্মবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্ত্তন বা রি-অ্যাক্‌ষণ (re-action) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল বা এই শ্রেণীর পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারী (re-actionary) বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। "সন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর "সন্ধ্যাতে" প্রায়ই সমাজের, বিশেষ নব্যশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, কোনও

কোনও শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র, কখনও কখনও বা গভীর বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে কোনও প্রকারেই সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁরা তাঁহার কথাবার্ত্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জ্জনরাশি পরিষ্কৃত করা অত্যাবশ্যক হয়। এ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু না কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃই আবর্জ্জনা ভালবাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের শ্রেষ্ঠজনকেও সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে স্বল্পবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে নির্ব্বিকার-চিত্ত দেশ-সেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। "সন্ধ্যা" পত্রিকায় সমাজের কোনও কোনও শ্রেষ্ঠজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া, সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, একেবারে সরাসরিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" পরিচালনা করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতটা পরিমাণে যে নিপীড়িত করিতেন, বহুদিন কাছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সকল আক্রমণ যে সর্ব্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাও নহে। তবে

অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর সমাজের "মেকি" নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবার প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বাদেশিকতা কখনই ফুটিয়া উঠিবে না, ইহাও তিনি মনে করিতেন। এই জন্য আর কোনও কিছু বিচার না করিয়া উপাধ্যায় এ সকল লেখা পত্রস্থ করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তাঁর আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর এ সকলে তাঁর প্রাণগত শ্রদ্ধাশীলতার অভাবও সূচিত হইত না।

প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে, সর্ব্বত্রই এক প্রকারের রক্ষণশীলতাও জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশই ছিল। তারই জন্য উপাধ্যায়ের হাত প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপরে আঘাত করিতে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইত। এই জন্যই উপাধ্যায় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া, কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাশীলতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল। এ বস্তু ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখায় ততটা পাওয়া যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়, উপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া প্রথমে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ও শেষে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এই খানেই, তাঁর- প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মূল ভিত্তিটী গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সর্ব্বত্রই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাজানুগত্যের একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবটা প্রবল হইয়া উঠে, সেই খানেই সমাজানুগত্যটা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া, পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্য ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও ক্রমশই কমিয়া গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্য্যাদা সমভাবে রক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মসাধনে ও সমাজ-জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য এখানে সমাজানুগত্য যে ধর্ম্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই কারণেই, রোমক-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের ভাবটাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক; যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক আর যাহা কিছুই হউক না কেন, ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একটা খেয়ালের চাপে উপাধ্যায় প্রাচীন সমাজশাসন পরিত্যাগ করেন নাই; খেয়ালের চাপে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারীও বলা যায় না।

ফলতঃ আমাদের সমাজের যাহা যেরূপ আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাকা বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা বলিতে শুনি নাই। "বন্দে মাতরম্" পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নূতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন

করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্য্য বিষয় ছিল। বন্দে মাতরম্ সর্ব্ব বিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় এ বিষয়ে একটু আপত্তি করেন। তাঁর মূল কথাটা আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি বলেন—"সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাধীনে সমাজ-সংস্কার বলিতেই বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে, কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শের স্বল্পবিস্তর অনুবর্ত্তনই বুঝাইয়া থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমরা ফিরিঙ্গীর একটা নকলের নকলের মতন হইয়া উঠিতেছি। এটী আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়া, সমাজের ও লোক-চরিত্রের সাংঘাতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। এই বিদেশীয় শক্তির প্রভাবকে প্রথমে আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে ও স্বদেশের জনগণকে সর্ব্বাদৌ আত্মস্থ করিতে হইবে। তারা আগে জাগুক। নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া পিটিয়া শুধরাইয়া লইবে।"

এই কথাগুলিতেই উপাধ্যায়ের সমাজনীতির যেমন, তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটী স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social organism বা সমাজ-জীব আধুনিক বিদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পরিভাষাটী তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজতত্ত্বটীকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা খুবই বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সকল সমাজেরই ভাল ও মন্দের

মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এইজন্যই বিলাতী সমাজের মন্দটীকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটীকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ নিতান্ত অসাধ্য, সেইরূপ আমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকুকে একান্তভাবে পরিহার করাও একান্ত অসম্ভব। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণু সকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে, প্রাণীর সুস্থ সবল অবস্থায়, তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য। সমাজ মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজেব রীতি-নীতি এবং শাসনসংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনতেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেই এ সকল অন্তর্নিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, সেখানে বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজসংস্কারসাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম্ম। এটী করিতে পারিলে, সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধিসকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। উপাধ্যায় এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব-প্রযত্নে, স্বদেশী সমাজের প্রাণমধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রবসকলকে প্রশমিত করিবার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এ কথাটী না বুঝিলে, উপাধ্যায় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারের কথা তেমন

বেশী বলিতেন না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বা সম্ভব হইবে না।

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই ভাবটীকে বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, করাচীতে যখন রোমক খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন, তখন, উপাধ্যায় যতটুকু পরিমাণে সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ততটুকুও ছিলেন কি না, সন্দেহ। আমরা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া কোন্ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে পরিণামে কোন্ স্থানে যাইয়া পৌছাইতে হইবে,—বিলাতে যাইয়া ইংরেজ-সমাজের গতিবিধি ও রীতিনীতি, মত ও আদর্শ এবং ভাবস্বভাব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উপাধ্যায় তাহা বেশ করিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। আর ঐ পথ যে আমাদের পক্ষে ভয়াবহ পরধর্ম্মের পথ,—উপাধ্যায় ইহাও বিশ্বাস করিতেন। এই কারণেই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কতকটা পরিমাণে স্বদেশের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। কামোপভোগপ্রবণ যৌবনকালে যাঁরা বিলাত যান, তাঁদের কথা যাহাই হউক না কেন, বেশী বয়সে, বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যাঁহারা বিলাতী সমাজের ভাবস্বভাব ও মতিগতি পরীক্ষা করিবার প্রত্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই, বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। অন্ততঃ উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এরূপই ঘটিয়াছিল। এই জন্যই উপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এতটা শঙ্কিত হইতেন।

এরূপ শঙ্কা যে একান্তই অস্বাভাবিক বা নিতান্তই অযৌক্তিক, এমনই কি বলিতে পারা যায়? ইংরেজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় ঝাঁঝের ব্যক্তিত্বাভিমানী

অনধীনতার ও গণতন্ত্রতার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, আমরা এক সময়ে সমাজ-সংস্কারব্যাপারটা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে তাহা তত সহজ নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্পে অল্পে জন্মিতেছে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সমাজচিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়িয়া উঠে বৈ হ্রাস হয় না। এক এক করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুলিকে ধীরভাবে তাকাইয়া দেখিলেই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। উপাধ্যায় এটী খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, এতটা সরাসরিভাবে সমাজ-সংস্কাবের চেষ্টায় আপনিও প্রবৃত্ত হন নাই, অপবকেও এ কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেন না।

প্রচলিত সংস্কার-প্রয়াসিগণ আমাদের জাতিভেদ-প্রথাটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এ ব্যগ্রতা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে এই জাতিভেদ-প্রথা যে আকার ধারণ কবিয়াছে, তাহাতে সমাজের স্থবিরতা যে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করাও যায় না। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও মহাজনেরা সময়ে সময়ে, এই বংশগত জাতিভেদ-প্রথার সংস্কার সাধন যে করেন নাই, তাহাও নহে। জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও বহুকালাবধি হিন্দুসমাজে যে বীজ-মিশ্রণ ঘটিয়া আসিয়াছে, ইহাও বোধ হয় প্রমাণ করা কঠিন নহে। এইরূপ বীজ-মিশ্রণে কেবল বিবিধ বর্ণসঙ্করেরই উৎপত্তি হয় নাই, যাঁরা সমাজে সঙ্করবর্ণ বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এরূপ বীজমিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মার্গের সাধক ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই এই জাতিভেদ-প্রথাকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমানেও যে এ প্রথার সংস্কার প্রয়োজন নয়, অথবা সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? উপাধ্যায় কখনও এমন

কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের কোনও বিভাগে এরূপ স্থবিরতা ও বদ্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি যে ভাবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদ-প্রথাকে ভাঙ্গিতেছেন বা ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, উপাধ্যায় তাহার সমর্থন করেন নাই। আর করেন নাই এই জন্য যে আমরা এই পথে আমাদের প্রাচীন জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিদেশের আমদানী আর এক প্রকারের ঘৃণ্যতর ও সহস্রগুণে অধিক অমঙ্গলকর জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিভেদ বলে না বটে। তাঁহারা ইহাকে শ্রেণীভেদ বলেন। কিন্তু যে নামেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, বস্তু দুটা এক না হইলেও যে নিতান্তই স-জাতীয় ইহা কি অস্বীকার করা যায়? আব এখানে প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্থবিরতা-পোষক যে বংশগত জাতিভেদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহার বদলে আমরা, সংস্কারের নামে, সমাজের বিপ্লবসাধক, পদগত বা ধনগত যে বিলাতী শ্রেণীভেদকে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমাদের সমাজে বরণ করিয়া লইতেছি, তাহার দোষ তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে উপাধ্যায় এই প্রশ্নটাই তুলিতেন। আব এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেবল একটা—বিলাতী শ্রেণীভেদের দোষ আমাদের জাতিভেদের দোষ অপেক্ষা আকারে ভিন্ন হইলেও, ওজনে কম নহে। আমাদের জাতিভেদ মানুষের মনুষ্যত্ব-বস্তুকে হয় ত কোনও কোনও স্থলে চাপিয়া রাখে, বিলাতী শ্রেণী-ভেদ তাহাকে পিষিয়া মারে। সুতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, এই পুরাগত জাতিভেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে, উপাধ্যায় এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

জাতিভেদের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও

সেই কথা। যেটাকে ভাঙ্গিয়া যেটাকে গড়িতে যাইতেছি, তাহা কি বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত জাতিভেদ, সেইরূপ বর্ত্তমানে যে আকারে বাল্যবিবাহ-প্রথা দেশে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের ঠিক সহায় যে নয়,—এ কথা উপাধ্যায় জানিতেন এবং মানিতেন। এ কুপ্রথা এক সময়ে আমাদের সমাজেও ছিল না। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ বিশেষ অবস্থাধীনে ইহা প্রচলিত হয়, স্থির করা বহু-বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। কিন্তু যখন এবং যে কারণেই ইহা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, হিন্দুসমাজে যখন প্রাণশক্তি প্রবল ছিল, তখন সমাজ আপনা হইতেই ইহার আনুসঙ্গিক অমঙ্গল ফলগুলি, একান্ত-ভাবে না হউক, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে নিবারণ কবিবাব উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। সমাজের সে প্রাণশক্তির হীনতা নিবন্ধন ক্রমে এ সকলও ব্যর্থ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ বাল্যবিবাহ-প্রথা যতটা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, কিছুকাল পূর্ব্বেও তত অনিষ্টকর ছিল না। এ সকলই সত্য। সকলে না হউক, অতি নিষ্ঠাবান অথচ চিন্তাশীল হিন্দু যাঁহাবা, তাঁহাবাও এ সকল স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথাকে জোর করিয়া বন্ধ করিলে, আব তাহার বদলে বিলাতী ছাঁচের যৌবন-বিবাহ ও যুননির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে আমাদের সমাজের বেশি অমঙ্গল আশঙ্কা হইবে কি না, এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহারা সহসা এ সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না।

এইরূপে আমাদের সমাজবিধানে যে সকল মন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া উপড়াইয়া দিলে, তার ভাল যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে কি না, এই ভয়েই উপাধ্যায় মহাশয় সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এতটা শঙ্কিত হইয়া চলিতেন। নতুবা আমাদের সমাজে বর্ত্তমান

অনিষ্টকর প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে অন্ধ ছিলেন, কিম্বা এ সকলের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ইচ্ছা করিতেন না,—এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্য ও সমাজ-নীতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। উপাধ্যায় স্বদেশী সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিতেন। ভক্ত লোকেও প্রয়োজন হইলে আপনার দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গি-বার জন্য তাহা ভাঙ্গেন না, অন্য দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্যও তাহাকে নষ্ট করেন না। আপনার দেবতার সেবার সৌকর্য্যার্থেই ভাঙ্গিয়া থাকেন এবং ভাঙ্গিবার সময়, শান্ত সমাহিত, শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া, ভক্তির সঙ্গেই ভাঙ্গেন। এরূপভাবে যদি কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, উপাধ্যায় তাঁহার সে চেষ্টাকে মাথায় করিয়া লইতেন, ইহা জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে এই সংযম, এই শ্রদ্ধা ও এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তিনি ইহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশ-বস্তুকে কেবল ভালবাসিতেন যে তাহা নয়, আন্ত-রিক ভক্তিও করিতেন। তাঁর সমাজানুগত্যের মধ্যে ও সমাজনীতির মূলে এই অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তিটী সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিয়া, তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

ও

ব্রাহ্মসমাজ

আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে অশেষ-প্রকারে ঋণী। আমরা এ ঋণ অস্বীকার করিলেও, ইতিহাস কখনও তাহা ভুলিয়া থাকিবে না।

আমরা আজ যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া জানি, দেশের লোকে তাহা এপর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই ধর্ম্মের হাওয়াটা দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্বল্পবিস্তর পড়িয়াছে এবং ইহার সাধারণ ভাবগুলি যে অনেকেই অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ কথাই কি অঙ্গীকার করা সম্ভব? ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বসিদ্ধান্তের উপরে আপনার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত দেশের ধর্ম্মচিন্তায় এখনও কোনও স্থান পায় নাই; কখনও যে পাইবে, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই। এ দেশে এবং অন্য দেশে এক সময়ে যাঁরা এই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্রমে সে সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দেখিয়া, তাহাকে বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে যুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহার প্রভাবে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন যে বহুল পরিমাণে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও অর্থসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও সত্য। ব্রাহ্ম-সমাজ যে আদর্শে ও যে ভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন, দেশের লোকে সর্ব্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার করা দূরে থাকুক,

বরং প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কারচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবেই যে আজ ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের, হিন্দুসমাজ নানা দিকে উদার ও উন্নতিমুখী হইয়া উঠিতেছে, ইহাই বা অস্বীকার করা যায় কি ?

আর ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান সমাজবিবর্ত্তনে একটা শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়াই, আপাততঃ এরূপ নিষ্ফলতা লাভ করিয়াও ফলতঃ দেশের ধর্ম্মকর্ম্মের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই কেন বিদেশীয় ভাবাপন্ন হউক না, ইহা যে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু-সমাজের উপরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারাটীকে আশ্রয় করিয়া ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে।

সমাজ-বিবর্ত্তনের ক্রম

এই সামাজিক বিবর্ত্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর্যাল (spiral) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ আছে বলিয়া মনে পড়ে না। কোনও সোজা খুঁটির গায়ে গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত, খানিকটা করিয়া ব্যবধান রাখিয়া, যদি একখানা কাপড় বা একটা রজ্জু জড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে এই কাপড়ের বা রজ্জুর গতি যেরূপ হইবে, সমাজ-বিবর্ত্তনের গতিও সেইরূপ। এইরূপ বক্রগতিকেই ইংরেজিতে স্পাইর্যাল-গতি বলে। এ গতি একটানা কেবল উপরের দিকে চলে না। একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে নামিয়া আইসে। কিন্তু এইরূপে নিম্নাভিমুখী হইয়াও, আগে যতটা নীচে ছিল, কদাপি ততটা নীচে আর যায় না। বরং নীচে নামিতে যাইয়াও সর্ব্বদাই আগে যতটা উচ্চে ছিল, প্রত্যেক স্থানেই

তার চাইতে উপরে থাকে। আব এরই জন্য মোটের উপরে এই গতি সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখী হইয়া পরিণামে চবম উন্নতি লাভ করে। সমাজবিবর্ত্তনের ধারাও ঠিক এইরূপ।

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক একবার নামিয়া আসিয়া আবার উপরে উঠিতে তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া যায়। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহার প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে homogeneityর বা নির্ব্বিশেষ-একাকারত্বের অবস্থা বলেন। দ্বিতীয় অবস্থাকে differentiationএর বা বিশিষ্ট বহুত্বের ও পার্থক্যের অবস্থা বলেন। তৃতীয় অবস্থাকে integrationএর বা মিলনের, সামঞ্জস্যের, একত্বের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই কথা তিনটী জীবজগতের বিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতেই মূলে গৃহীত হইয়াছে। সামাজিক বিবর্ত্তনে এই অবস্থাগুলির অন্যরূপ নাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ব্যবহার করিলে, বিবর্ত্তনের প্রথম পাদ বা প্রথম অবস্থাকে তামসিক, মধ্যমপাদ বা মধ্যেব অবস্থাকে রাজসিক এবং শেষের পাদকে বা অবস্থাকে সাত্ত্বিক বলাই সঙ্গত হইবে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনীর সৃষ্টিপ্রকরণে এই বিবর্ত্তন-ক্রমটীই ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি অবস্থা নির্ব্বিশেষ-একাকারত্বেরই অবস্থা। ইংরেজিতে ইহাকে স্বচ্ছন্দেই homogeneityর অবস্থা বলা যাইতে পারে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনী নিখিল বিশ্বের বীজরূপী, অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অণ্ড-বস্তুর লক্ষণ নির্ব্বিশেষত্ব ও একাকারত্ব। কারণাব্ধি-মধ্যে, এই অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডের ভিতরে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিরণ্যগর্ভ বা মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শন এই তত্ত্বকেই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই তত্ত্বে সত্ত্ব, রজঃ,

তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্ত্তনে, সৃষ্টিপ্রকরণে, homogeneityর অবস্থা। এই সাম্য ভাঙ্গিবা মাত্রই মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যায় এবং নির্ব্বিশেষ-একাকারত্ব হইতে ক্রমে, রজঃপ্রাধান্যহেতু, সবিশেষ ও বহু-আকারসম্পন্ন বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহাই differentiationএর বা ভেদ-প্রতিষ্ঠার অবস্থা। ভেদমাত্রেই বিরোধাত্মক, আর বিরোধমাত্রেই উপায়পর্য্যায়ভুক্ত; তাহার নিজস্ব কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই। বিরোধ আপনাকে বিনাশ করিয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং এই বিরোধের বা differentiationএর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের প্রতিষ্ঠা হইলেই তবে সে ভেদ আপনার সার্থকতা লাভ করে। এইজন্য differentiationএর পরে integration হইবেই হইবে। এই integration একত্বের, অভেদের, কিম্বা অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক মহান্ একের প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই একত্বে বা integrationএ বিবর্ত্তন-প্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। Homogeneity, differentiation, integration—বিবর্ত্তনক্রিয়ার এই তিন পাদের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে রজোগুণের, তৃতীয় পাদে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে।

এই ত্রিপাদকে আশ্রয় করিয়াই জনসমাজ নিয়ত বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সমাজবিবর্ত্তনের এই ত্রিপাদচক্রে যে সমাজ-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কেবল একবার মাত্র ঘুরিয়া আইসে, তাহা নয়। সমাজ-বিবর্ত্তনের গতি কখনও কোথাও থামিয়া যায় না। সমাজ নিয়তই বিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং এই ত্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। তমঃ রজঃ সত্ত্ব এই তিনগুণ, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, একের পর অন্যে, বারম্বার প্রবল হইয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা করিতেছে। যুগে যুগে

একবার করিয়া এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিপাদচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদিতে সমাজ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিকতা, কালবশে, শাস্ত্রে ও সংস্কারে, আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই তখন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হইয়া প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সমাজ তখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতিমাত্র লাভ করে। এই জড়ত্ব—তমেরই ধর্ম্ম। এ অবস্থা তামসিক homogeneityরই অবস্থা। ক্রমে তখন আবার সমাজমধ্যে রজোগুণ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই রজঃপ্রাবল্য নিবন্ধন অসার সমাজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজসিক differentiationএর অবস্থা। সর্ব্বশেষে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া এই ভেদবিরোধের উপশম ও শান্তি হইতে আরম্ভ করে। সমাজ তখন অভিনব সামঞ্জস্যের ও সঙ্গতির সাহায্যে পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া আরো উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে বক্রভাবে, স্পাইর‍্যাল (spiral) গতিতে সমাজ ক্রমে উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবর্ত্তনে ব্রাহ্মসমাজের স্থান

বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে, সমগ্র ভারতসমাজ অগাধ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম্ম প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জ্ঞানহীন, সমাজ আত্মচৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামসিকতা শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিকতার ভাণ করিয়া, ভীতিকে শম, নির্ব্বীর্য্যতাকে দম, নিদ্রালস্যসম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারতসমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছন্ন অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্ম, য়ুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে

আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নূতন শক্তি-সংঘর্ষে এই তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব রাজসিকতা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই বিচিত্র যুগসন্ধিকালে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। য়ুরোপীয় সাধনার এই প্রবল রাজসিকতাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী সমাজ যে ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবাদী ধর্ম্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক ভারতের বিবর্ত্তনগতিকে homogeneity বা thesisএর অবস্থা হইতে differentiation বা antethesisএর অবস্থায় লইয়া যান। আর তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে ঘোরতর তামসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার মধ্যে অভিনব রাজসিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। প্রথম—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয়—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করে সত্য; কিন্তু তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর পরবর্ত্তী নেতৃবর্গ যে ভাবে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজা একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্যমর্য্যাদাভ্রষ্ট করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্ম্মসাধনে যে গুরুরও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনও অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যেমন শাস্ত্র সেইরূপ

গুরুকেও বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকৃপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে, ধর্ম্মের কোনও অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি একপ্রকারেব স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশখৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার কবেন। মহর্ষি তাঁহাব আপনার আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কবেন। রাজা বৈদান্তিক হইলেও তাঁর পূর্ব্বতন কোনও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে যে সকল যুক্তিপ্রমাণা-দিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বতন ঋষি ও মনীষিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষিপন্থার অনুসরণ করিয়াই, আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচিন বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বদেশের ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়, অথচ পুরাতনের উপরেই, পুরাতনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, পুরাতনের শিক্ষা ও সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াই—দেশকালের উপযোগী নূতন সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষিও পুরাতনকে কতকটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিজাত প্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতার অনুরোধে। তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সঙ্গে তাঁর এই চেষ্টার কোনই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ছিল না। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে

সত্য ; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্যমর্য্যাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র। উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন ;—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোনও শ্রুতির বা উত্তরার্দ্ধ, কোনওটীর বা অপরার্দ্ধ, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম, গ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন। অতএব মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁর নিজের। ইহার মতামত তাঁর, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলেও, তার যতটুকু মর্য্যাদা থাকিত, উপনিষদের বুক্‌নী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্য্যাদা লাভ করে নাই। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদিগণের অন্যতম উপদেষ্টা মন্‌কিওর ডি কন্‌ওয়ের (Moncure D. Conway) সঙ্কলিত শাস্ত্রসংগ্রহের বা Sacred Anthology'র যে পরিমাণ ও যে জাতীয় শাস্ত্রপ্রামাণ্য ও শাস্ত্রমর্য্যাদা থাকা সম্ভব, মহর্ষির সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের সে পরিমাণ ও সেই জাতীয় শাস্ত্র-প্রামাণ্য এবং শাস্ত্রমর্য্যাদাই আছে বা থাকিতে পারে। তার বেশী নাই।

কিন্তু রাজা রামমোহন যে সমীচিন মীমাংসার সাহায্যে স্বদেশের পুরাতন সাধনার উপরেই নূতন যুগের নূতন সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-প্রতিষ্ঠার অনুকূল কাল তখনও উপস্থিত হয় নাই। লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। ফলতঃ যে বিবেক জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও প্রচলিতের প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এদেশে তখনও সে বিবেক জাগে নাই। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সমন্বয়, সঙ্গতি—ইহাই মীমাংসার ক্রম। যতক্ষণ

না শাস্ত্রে সন্দেহ জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার প্রয়োজনই উপস্থিত হয় না। রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা প্রাচীন ও প্রচলিতের অসারতা ও ভ্রান্তি দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি নূতন মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের লোকের মনে তখনও এরূপ গভীর সন্দেহের উদয় হয় নাই ; তাঁহাদের বিবেকও জাগে নাই। প্রাচীনকে লইয়াই তাঁরা তখনও সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও স্বাভিমতের মধ্যে তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। দেশের লোকে শাস্ত্র কি, তাহা জানিতেন না। জানিবার প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্মায় নাই। সুতরাং রাজা যে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা বুঝিবার ও ধরিবার বাসনা এবং শক্তি দু'য়েরই তখন একান্ত অভাব ছিল।

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, মহর্ষির সময়ে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজার জীবদ্দশায় অষ্টাদশখৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করে নাই। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা মোহম্মদীয় যুক্তিবাদেরই ফল, খৃষ্টীয় যুক্তিবাদের ফল নহে। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখনও কোনই পরিচয় হয় নাই। পাটনায় যাইয়া, পারসী ও আরবী পড়িয়া, মোহম্মদীয় তন্ত্রের মোতাজোলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াই, রাজা সর্ব্বপ্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহর্ষি যে এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহা ইংরেজি শিক্ষারই ফল। তাঁহার সময়ে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবেই, আমাদের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।

আর যে বিচার বা criticismকে অবলম্বন করিয়া দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সেই বিচার বা criticismকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষির ধর্ম্মমীমাংসার এবং তত্ত্ব-সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়! এই বিচার বা criticismএর উপরেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই যুক্তিবাদ আগমের বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই যুক্তিবাদের বিচারপদ্ধতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকিক ন্যায়ের বা formal logic এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার বা criticism ও শাস্ত্রাশ্রয় বর্জ্জন এবং সদ্‌গুরুর শিক্ষা ও সাহায্যকে উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী। আর প্রত্যক্ষ বলিতে ইহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝিয়া থাকে। এই যুক্তিবাদের বা Rationalism এর সঙ্গে জড়বাদের বা Materialismএর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এইজন্য য়ুরোপে যখনই যেখানে যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা Materialismও প্রবল হইয়াছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়ই "নান্যদস্তীতি-বাদী।" এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণাদির ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগম্য, একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর য়ুরোপীয় আস্তিক-মতাবলম্বী ধর্ম্মসংস্কারকেরা তাহাই করিয়াছেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহারই উপরে ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense

সভ্য অসভ্য সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। সুতরাং কোনও বাহ্য কারণের বা অবস্থার যোগাযোগে ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া, এই ধর্ম্মবুদ্ধিটা সত্য। আর ইহার একটা স্বতঃপ্রামাণ্যও আছে। এই ভাবেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহর্ষিও ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যাইয়া কতকটা এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী আস্তিক-সম্প্রদায় যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়াছেন, মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমীমাংসায় তাহাকেই আত্মপ্রত্যয় নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আত্মপ্রত্যয় বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত স্বানুভূতিরই নামান্তর মাত্র। বেদান্ত যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন, মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় ঠিক সেই বস্তু নয়। অন্ততঃ তাঁহার প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসা যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা যে বেদান্তোক্ত আত্মপ্রত্যয়, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে এই তথাকথিত আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের ও প্রামাণ্যের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষিও এই স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনরায় জাগাইয়া তুলেন।

এদেশে তখন এরূপভাবে লোকের স্বানুভূতিকে জাগাইয়া তোলা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কেবল শাস্ত্রাবলম্বনে ধর্ম্মসাধন করিবে না, শাস্ত্রযুক্তি মিলাইয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিবে,—লোকে এই প্রাচীন ও সমীচিন উপদেশ তখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানও একরূপ লোপ পাইয়াছিল। তাহা না হইলে মহর্ষি যেভাবে চারিজন ব্রাহ্মণকে কাশীতে বেদ পড়িবার জন্য পাঠাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষ্যে বেদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করেন, তাহা আদৌ সম্ভব হইত না। ইঁহারা কেবল ব্যাকরণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন

করেন নাই। রাজা এই মীমাংসার পথ ধরিয়া শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, মহর্ষির ন্যায় তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রাচীন শ্রুতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে চক্ষে বেদকে দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পণ্ডিতেরাও যে ভাবে বেদের অতিপ্রাকৃত মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন,—ভারতের প্রাচীন মীমাংসকগণ সেরূপ করেন নাই। রাজা এ সকল কথা জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে মহর্ষির ন্যায় শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিতে হয় নাই। কিন্তু তখনও এ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। দেশের লোক তখনও এ সমীচীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে সময়ে এ সকল সিদ্ধান্তের কথা বলিলেও, লোকে ভাল করিয়া তাহা বুঝিত না, অথচ না বুঝিয়াও তাহারই মধ্যে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা ও তামসিকতার সমর্থন করিবার যুক্ত্যাভাস পাইয়া, সেই নির্জীব অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। তখনকার প্রধান কর্ম্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু সংস্কার নাশ করা। সাধুমীমাংসা মাত্রেই সম্যগ্‌দর্শী। আর সম্যগ্‌দর্শন নিম্নাধিকারী লোকের পক্ষে কর্ম্ম-চেষ্টার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একান্ত অন্তরায় হইয়া থাকে। যে 'গোঁ'এর ভিতর দিয়া রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল তমোগুণকে অভিভূত করিয়া থাকে, অসময়ে সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ করিলে সে 'গোঁ' জন্মা-ইতে পারে না; সুতরাং তামসিকতাও নষ্ট হয় না। আধুনিক ভারতের নূতন সাধনার প্রয়োজনেই রাজার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে যে সম্যগ্‌দর্শনের পরিচয় পাই, মহর্ষির প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসায় সে সম্যগ্‌দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নাই; উঠিলে তাঁহার দ্বারা বিধাতা যে কাজ করাইয়াছেন, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

রাজা রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও, প্রকৃত-

পক্ষে একটা নূতন ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই "ব্রহ্মসভার" ভজন-সাধনকে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে গড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণ যতটা পরিস্ফুট হয় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই আপনার ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু এই স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকেই তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে স্থাপন করিতে যাইয়া, এক প্রকারের শাস্ত্রপ্রামাণ্যও প্রদান করেন। এইজন্য তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মবস্তুটী যে একান্তই অভিনব ও স্বরচিত, ইহার যে, কোনই প্রাচীন ভিত্তি বা প্রামাণ্যমর্য্যাদা নাই, লোকে ইহা সহজে ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শাস্ত্রজ্ঞান একরূপ লোপ পাইয়াছিল। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও বেদবেদান্তাদির কোনই ধার ধারিতেন না। সুতরাং আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিসম্ভূত সিদ্ধান্তকে মহর্ষি যে অদ্ভুত শ্রুতিমর্য্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, তাহার কৃত্রিমতা ও অশাস্ত্রীয়তা, দেশের লোকে একেবারেই বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। ফলতঃ প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ড পরিহার করিয়াই, দেবেন্দ্রনাথ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন; নতুবা তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্তই অশাস্ত্রীয় ও অপ্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার উপরে কোনই নির্য্যাতন হয় নাই। বরঞ্চ তাঁর সিদ্ধান্ত ও সাধনকে উচ্চতর অধিকারের হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বাভিমানী য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সাধনা ও চরিত্রগুণে, তাঁর উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের প্রভাব ভাল করিয়া

ফুটিয়া উঠে নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রভুত্বাভিমান বিদ্যমান ছিল। তিনি যে সমাজে, যে পরিবারে, যেরূপ বিভবগৌরবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন ও যে সৌভাগ্যের অঙ্কে লালিত পালিত হ'ন, তাহাতে এরূপ প্রবল প্রভুত্বাভিমান যে তাঁর মধ্যে জন্মিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তার পর তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, তার মুমূর্ষু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং এক দিকে আপনার সাধনের ও অন্যদিকে আপনার অর্থের দ্বারা যেরূপে ইহাকে লোকসমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে এই ব্রাহ্মসমাজে যে তাঁর একটা একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর এই কারণে মহর্ষি আদিব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা যে একান্তই শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত, এ ভাবটা বহুদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনার সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থকেই প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন গুরু-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম শিষ্যমণ্ডলী, তাঁহাকেই নূতন ধর্ম্মের গুরুরূপে বরণ করেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত, শুদ্ধ স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে বাহ্যতঃ ও লোকতঃ গুরু ও শাস্ত্র উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয়। আর এই জন্য স্বদেশের ধর্ম্মের সঙ্গে সাধন ও সংস্কারাদি বিষয়ে ইহার বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইলেও, ভাবগত কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদা আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদের এই দাবীর একান্ত প্রতিবাদ করেন নাই।—

কিন্তু এইরূপে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যে পথ ধরিয়া আপনাদের ধর্ম্ম-সাধনে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে, এদেশে, কখনও

এ বস্তু মিলে নাই। আমাদের সাধনায় শাস্ত্র-গুরু-আনুগত্যের একটা নিগূঢ় সঙ্কেত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সে সঙ্কেতটী লাভ করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আনুগত্য স্বীকার ও শাস্ত্র আপনি পুরাতন শাস্ত্রে আবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদেব গুরু ও শাস্ত্র কিম্বা গুরূপদেশ, দু'এর কেহই স্বয়ং-বৃত ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। পূর্ব্বতন গুরুপরম্পরা ও সনাতন শাস্ত্র-ধাবাব সঙ্গে ইহাদেব একটা গভীব ও অঙ্গাঙ্গী যোগ সর্ব্বদাই রক্ষিত হয়। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে এ যোগ থাকে নাই। আর এইরূপ স্বয়ংবৃত গুরুর বা মনগড়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা কদাপি কোথাও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পাবে না। যেখানেই এরূপ গুরু-শাস্ত্রেব সৃষ্টি হইয়াছে, সেই খানেই ক্রমে বিদ্রোহীদলেব উৎপত্তি হইয়া, সম্প্রদায়কে শতধা বিচ্ছিন্ন কবিয়াছে। রোমক খৃষ্টীয় সঙ্ঘেব প্রামাণ্য একদিকে পুরাতন শাস্ত্রধারার ও অন্যদিকে পুবাগত গুরুপারম্পর্য্যের উপবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, সেখানে ধর্ম্মমত লইয়া দলাদলির প্রকোপও অত্যন্ত কম। প্রোটে-ষ্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টীয় সঙ্ঘে শাস্ত্র আছে, কিন্তু গুরুপরম্পবার ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রধারার সৃষ্টি হয় নাই; এখানে প্রত্যেকে আপনার বিচার ও বুদ্ধি, খুসি ও খেয়াল মত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অন্যদিকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে গুরুপরম্পবারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর এই দুই কারণে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ সঙ্ঘ এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া, ইহাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, মূলতঃ এই একই কারণে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই, পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে তিনটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া প্রাচীন শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া,

আপনার ব্রাহ্মসমাজে নূতন গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এ বস্তু পাওয়া যায় না। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত আত্মপ্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্যমর্য্যাদা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচারবুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। পারিলে, তাঁর নিজের গুরুপদ-গৌরব ও তাঁর সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের শাস্ত্রপ্রামাণ্য, তিনি দু'এর কিছুরই দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু মহর্ষি যে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের (Individualistic Rationalism) উপরে আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অপরিহার্য্য পরিণামকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আপনার অসঙ্গত একতন্ত্রপ্রভুত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন। যে ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞান বা Conscienceকে আশ্রয় করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিলেন, সেই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবকদল, তাঁহার একতন্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি করেন। এ জগতে প্রত্যেক বস্তু তার অনুরূপ বস্তুকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। স্বদেশের শাস্ত্রগুরুর বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের দ্রোহিতা, আপনার কর্ম্মবশেই, তাঁহার নিজের সমাজে, আপনার শিষ্যগণের ভিতরে, এই নূতন দ্রোহিদলের সৃষ্টি করিল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে, এমন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল, যাহাতে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, সেই বিরোধই আরো বেশী বিশদ ও তীব্র হইয়া উঠিল।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। উভয়েই প্রকৃতপক্ষে সারসংগ্রহবাদী ছিলেন।

এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগকে ইংরেজিতে Eclectic বলে। কিন্তু মহর্ষির যুক্তিবাদ যতটা সংযত ও সারসংগ্রহবাদ যে পরিমাণ স্বাদেশিক ছিল, কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদ ততটা সংযত ও তাঁর সারসংগ্রহবাদ বা Eclecticism সে পরিমাণ স্বাদেশিক রহে নাই। মহর্ষি আপনার বিচারবুদ্ধিকে সত্যের একমাত্র ও অনন্যপ্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র এই পথে যাইয়াই, জগতেব সমুদায় ধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এই শ্লোকসংগ্রহকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। মহর্ষির ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে বা ব্রহ্মসাধনে এই বিশ্বজনীনতা রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুবই ফুটিয়া উঠে। এইজন্য যুক্তিবাদের নিক্তিতে ওজন করিলে, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত, সিদ্ধান্ত, সাধনাদি, সকলই মহর্ষির মত, সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এইজন্য এই নূতন সমাজকে প্রথমে গণতন্ত্রতার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার কতকটা চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার ফলে মহর্ষির সমাজে ব্রাহ্মসাধারণের ব্যক্তিত্বাভিমানী 'সহজবুদ্ধি'র বা Intuitionএর যতটা প্রভাব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, কেশব-চন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, প্রথম প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহর্ষির উপদেশে ও সাধনে একটা হিন্দুভাব সর্ব্বদাই জাগিয়া ছিল। এই কারণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ-মধ্যে একটা বিনয়, একটা শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাবও সর্ব্বদাই দৃষ্ট

হইত। এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুব প্রকৃতিগত বস্তু। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টীয় সাধনা ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceকে বাড়াইতে যাইয়া, ধর্ম্মের এই প্রাণগত বস্তুগুলিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে এই খৃষ্টীয় ভাবের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজেও ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceএব ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া, এই বিনয়, সংযম ও শ্রদ্ধা বস্তুকে এক প্রকাব নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানেব প্রাধান্য আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদী ধর্ম্মসকলেব প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া, আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্ম্মের স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠে, মহর্ষির অধীনে, তাঁব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, ততটা ফুটিয়া উঠিতে পাবে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষ্যগণ জীবনেব সকল বিভাগে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে, ধর্ম্মসাধনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, সর্ব্বত্র, এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিফলিত করিতে যাইয়া, আধুনিক ভাবত সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মমীমাংসায় ও ধর্ম্ম-সাধনে যে রাজসিক ভাব জাগাইয়াছিলেন, তাহাকে আবো প্রবল কবিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনে যে anti-thesisএব প্রতিষ্ঠা কবেন, কেশবচন্দ্র তাহাকেই আরো বিশদ ও তীব্র করিয়া তুলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে স্থান ছিল; তার পবে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যে স্থান অধিকার করেন; তৎপরবর্ত্তী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই স্থানই প্রাপ্ত

হ'ন। ইঁহারা তিন জনেই, একের পর অন্যে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেশের ইংরেজিশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ভাবকে স্বল্প বিস্তর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভা-গুণে তাঁহার প্রথম জীবনের উদার শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়াই, ব্রাহ্মসমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ সাধনে কেশবচন্দ্র যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ বা শিবনাথ ইঁহাদের কেহই সে পরিমাণে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যেমন মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের, সেই-রূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুতেই মহর্ষির সাধননিষ্ঠা এবং কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে পারেন না, সত্য। কিন্তু অন্য দিকে যে সকল বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার শুভযোগাযোগ ব্যতীত কি মহর্ষি কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর কর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে কখনই কোনও প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না, শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে সে সকল যোগাযোগও ঘটে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পুত্র। পিতৃবিয়োগের পরে কিছু-কাল দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ভিতরে পড়িয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সংযম ও সততাগুণে কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনিসমাজের অগ্রণীদলভুক্ত হইয়া উঠেন এবং তখন হইতে তাঁহার অর্থেই ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন মত ও আদর্শ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়। বাঙ্গলা

সাহিত্যের এবং আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের সাধনার ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী মহর্ষির অর্থেই স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকগণ, ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই তখন মহর্ষির অর্থানুকূল্যে ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল না থাকিলে, শুদ্ধ আপনার চরিত্রের বা সাধনার বলে সে সময়ে মহর্ষি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে এতটা বাড়াইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর ব্রাহ্মসমাজে কালক্রমে মহর্ষির যে একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার অর্থবলই ইহারও একটা প্রধান কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র মহর্ষির মত ধনী ছিলেন না বটে ; কিন্তু রামকমল সেনের পৌত্র বলিয়া কলিকাতা-সমাজে তাঁহারও একটা বিশেষ আভিজাত্য মর্য্যাদা ছিল। ফলতঃ সামাজিক হিসাবে, কলুটোলার সেনেরা, বৈদ্য হইয়াও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে না করিতেই, কেশবচন্দ্রের দৈবীশক্তিশালিনী বাগ্মীপ্রতিভা দেশের ঊর্দ্ধতন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপই, ইংরেজ রাজ-পুরুষগণ যাঁহাদিগকে বাড়াইয়া তুলিতেন, স্বদেশী সমাজেও, আপনা হইতেই, তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইত। এই সকল বাহ্য যোগাযোগ ব্যতীত কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভাও এত সহজে ও এত অল্পকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কেবল যে মহর্ষির সাধননিষ্ঠা বা কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভাই নাই তাহা নহে। যে সকল বাহ্যঘটনা ও অবস্থার যোগা-যোগের সাহায্যে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আপনাদিগের কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া

তুলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাগ্যে সেইরূপ কোনো যোগাযোগও ঘটে নাই। শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান। একরূপ পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—এ সকলের কিছুই তাঁর ছিল না। আর এ সকল ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্ম-সমাজের বিকাশ সাধনে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র যে কাজটী করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা করিয়াছেন।

ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শাসন, আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার প্রেরণা,—এ সকলে মিলিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে যে অভিনব অনধীনতা বা Independenceএর ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রাহ্মসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস দুই এক বস্তু। এই অভিনব অনধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজকে যতটা অধিকার করে, দেশের অপর কোন সম্প্রদায়কে ততটা অধিকার করিতে পারে নাই। অপরে আংশিকভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মসমাজই ইহাকেই সম্পূর্ণভাবে জীবনের সকল বিভাগে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে। আর ব্রাহ্মসমাজও যে প্রথমাবধিই এই আদর্শকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, এমনও নহে। মহর্ষি ইহাকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্র তদপেক্ষা বেশী করিয়াছিলেন। আর ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই অনধীনতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অনধীনতা-মন্ত্রের সাধক এবং এই অনধীনতা-ধর্ম্মের—বা 'Religion of Freedomএর পুরোহিতরূপেই, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, এ দেশের আধুনিক ধর্ম্ম-জীবনে ও কর্ম্মজীবনে, প্রথমে মহর্ষির, তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং সর্ব্ব-শেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষার ও চরিত্রের যাহা কিছু প্রভাব প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধানতঃ তত্ত্বমীমাংসায় ও ধর্ম্মসাধনেই এই অনধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র ইহাকে আরও একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে,—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীনতা-প্রবৃত্তি ক্রমে যতটা বলবতী ও বহুমুখী হইয়া উঠে, কেশবচন্দ্র বেশিদিন তাহার সঙ্গে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তাহারই জন্য দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাঁহার পূর্ব্বপ্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায়ই বস্তুতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অনধীনতা আদর্শের সাধক ও প্রচারকরূপে নূতন সমাজের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাই তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতার অন্তরালে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, একটা সমাজানুগত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল। আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তে মহর্ষি কতকটা য়ুরোপীয় আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত এমনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্ব্বদাই স্বদেশের সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য মহর্ষি অনেক সময় মর্য্যাদা-হানির ভয়েই অনেক অযৌক্তিক সমাজবিধানও মানিয়া চলিতেন। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার আভিজাত্যের আর কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাদেশিকতার ফল ছিল।

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মূলে হিন্দুর সমাজানুগত্য নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় Non-conformist Conscience এর নৈতিক প্রভাবই বিদ্যমান

ছিল। এই Non-conformist Conscience একটা অদ্ভুত বস্তু। আপনার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের প্রতিষ্ঠায় ইহা সর্ব্বদাই অত্যুদার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরের ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই বস্তুই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। ইহা ধর্ম্মের ও সত্যের দোহাই দিয়া একদিকে আপনাকে অপরের আনুগত্য হইতে মুক্ত করিতে চাহে। অন্যদিকে আপনার মতামতকে অপরের উপরে চাপাইয়া তাহাদের মুক্তিবিধানের জন্যই তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণও করে। এই জন্য এই Non-conformist Conscience যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীল হয়। কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতা এই ধাতেরই ছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু মহর্ষির ভিতরকার ভাব ও আদর্শ সর্ব্বদাই হিন্দু ছিল। কেশবচন্দ্রের ভিতরকার ভাব, বিশেষতঃ প্রথমজীবনে, বহুল পরিমাণে পিউরিট্যান খৃষ্টীয়ান (Puritan Christian) আদর্শের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকেও তিনি এইভাবেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে মহর্ষির হিন্দুভাবাপন্ন কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিট্যানভাবাপন্ন রক্ষণশীলতা একেবারেই ছিল না বলিলেও চলে। খৃষ্টীয় জগতে পিউরিট্যান্‌গণ সংসারের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধে একটা তীব্র পবিত্রতার আদর্শের অনুসরণ করেন। কেশবচন্দ্রও যৌবনাবধিই এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মে ও সাধনায় যাহাকে শুদ্ধতা বলে, এই খৃষ্টীয়ানী পবিত্রতা ঠিক সে বস্তু নয়। আমাদের দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা আধুনিক খৃষ্টীয় সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র যে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা ইংরেজি পিউরিটি, সংস্কৃত শুদ্ধতা নহে।

এই পিউরিটি রক্ষা করিবার আত্যন্তিক আগ্রহ হইতেই কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর সংযমেব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে মহর্ষির স্বাভাবিক সমাজানুগত্য কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিটিপ্রবণতা কখনই ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রকৃতি-গত আস্তিক্য-বুদ্ধিও ছিল। আব নিজেদের প্রকৃতির এই আভ্যন্তবীণ ধর্ম্ম-প্রবণতার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়াও ইঁহারা সংশয়বাদী হইয়া উঠেন নাই। ইঁহাদিগের অটল ঈশ্বর-বিশ্বাস আপন আপন প্রকৃতিব অন্তঃস্থল হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যুক্তি-তর্কেব দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। ফলতঃ এই প্রকৃতিগত ঈশ্বব-বিশ্বাসকেই মহর্ষি আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন। আপনাব ধর্ম্মসিদ্ধান্তে কেশবচন্দ্র এই প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধিকেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর খৃষ্টীয়ান দর্শনের পরিভাষায় ইন্‌টুইসন্ (intuition) নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহর্ষির আত্মপ্রত্যয়ই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের ইন্‌টুইসন্। আর এ দু'ই মূলতঃ ও বস্তুতঃ তাঁহাদের নিজেদের প্রকৃতিগত ব্যবসায়া-ত্মিকা আস্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। এই প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইসন্‌রূপ চঞ্চল ভিত্তিব উপরেও আপনাদিগের এমন অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু সংশয়-প্রবণ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনসম্পদ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ এবং অঘোরনাথ প্রভৃতি দুই চারিজন ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং উপাসকগণের মধ্যে

প্রায় কাহারই প্রকৃতির ভিতরে মহর্ষির বা কেশবচন্দ্রের ন্যায় কোনও বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। সুতরাং ইঁহারা অতর্ক-প্রতিষ্ঠ পরম-তত্ত্বকে লৌকিক তর্কযুক্তির উপরেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্রের বাগ্মীপ্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য মনীষীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুরূপে বরণ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। অতি সংশয়বাদ সর্ব্বত্রই এই ভাবে অনেক সময় অতি-বিশ্বাসে যাইয়া পড়ে। এই অতিসংশয়বাদেরই ইংরেজি নাম Scepticism এবং ইংরেজিতে যাহাকে Credulity বলে বাঙ্গলায় তাহাকেই অতি-বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় ও অপ্রত্যক্ষতত্ত্বে যাঁহারা কোন মতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারাই Sceptic বা অতি-সংশয়বাদী। আর এই অতিসংশয়বাদের তাড়নাতেই এই সকল লোকে অনেক সময় এমন সকল বিষয়েও আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যাহা কখনও কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না ও হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতির অদ্ভুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে অতি-সংশয়বাদ বা Scepticism হইতেই অতি-বিশ্বাসের বা credulity'র উৎপত্তি হয়। কেবশচন্দ্রের অনুচরগণের মধ্যে মূলে যাঁহারা অতি-সংশয়বাদী ছিলেন তাঁহাদেরই একদল কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অতি-বিশ্বাসভরে তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ রূপে বরণ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক আনুগত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত ও উপদেশানুসারে আপনাদিগের ধর্ম্ম-জীবন

ও কর্ম্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জ্জন এবং কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষত্বের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদিগের স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ তর্ক-যুক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বকে ও ধর্ম্মসাধনাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবাব চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর হইতেই তাহার ভিতরে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

প্রথমে মহর্ষি এবং তাবপরে কেশবচন্দ্রও আপনার প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে যে পথে পরিচালিত করেন, তাহাতে এরূপ বিরোধ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মহর্ষির সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই গড়িয়া উঠে। আর বস্তুতঃ সেই জন্যই কেশবচন্দ্রকে শেষজীবনে "নববিধানের" প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ বা Rationalism, প্রাকৃত বুদ্ধির প্রেরণায়, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে ইংরেজিতে Deism বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Theism বলা যায় কি না সন্দেহ। Deism আর Theismএ পার্থক্য এই যে, একেতে ঈশ্বরতত্ত্বকে বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্ববিধানরূপে এবং অপরে শক্তিমান পরমপুরুষ বা বিশ্ববিধাতা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ বাবুর কথায়, Deism এর ঈশ্বর শক্তি, Theismএর ঈশ্বর ব্যক্তি। আর প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরকে শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তি বা বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মহর্ষির ঈশ্বর কেবল শক্তি মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্তু মহর্ষির ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের উপরে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তাঁর ভাবাঙ্গ-সাধনেরই ফল। এই ভাবাঙ্গসাধনে

মহর্ষি হাফেজ প্রভৃতি মোহম্মদীয় ভক্তগণেরই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ন্যায় ও য়ুরোপীয়-যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মের পন্থার অনুসরণ করেন নাই। এই গভীর ভাবাঙ্গসাধনের গুণেই মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম Deism হয় নাই, কিন্তু অতি উচ্চদরের Theism রূপেই তাঁর জীবনে ও চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরও শক্তিমাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের প্রখর সংজ্ঞানের বা conscienceএর প্রেরণায় প্রথম হইতেই তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি ভাবাঙ্গ-সাধনের ভিতর দিয়া, মোহম্মদীয় ভক্তগণের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, তাঁহার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে, তাঁর গভীর পাপ-বোধের বা Ethical Consciousnessএর ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান সাধকগণের দৃষ্টান্তে, ও শিক্ষায় আপনার প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজে ইঁহারা উভয়েই যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার উপরে Deism এরই প্রতিষ্ঠা হয়; Theismএর প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্ব যে Theism হইয়া উঠে, ইহাঁদের প্রকৃতির ও সাধনার বিশেষত্বই ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ।

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্তিবাদের উপরে কোনও প্রকারের গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলা যে অসম্ভব, মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ইহা ক্রমে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ইঁহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই যুক্তিবাদকে ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সাধক অনুকূল অবস্থাধীনে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাকৃত-বিচার-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু এই সকল ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধু মহাজনের সাক্ষ্যের উপরেই

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে,—মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই জীবনের শেষভাগে এই মত প্রচার করেন। কিন্তু যে ঈশ্বরানুপ্রাণনের উপরে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র দুজনেই পরে আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্যমর্য্যাদা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের মূলগত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাভিমান কিছুতেই সে ঈশ্বরানুপ্রাণনের মতকে সমর্থন করে না।

ফলতঃ যে আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে ব্রাহ্মসাধারণের তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকারের অনন্য-সাধারণত্বের বা অপ্রাকৃতত্বের দাবী কখনই গ্রাহ্য হয় না। এই যুক্তিবাদ ধর্ম্মসাধনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারে না। সমাজগঠনে ও রাষ্ট্রীয়জীবনে এই যুক্তিবাদ কেবল গণতন্ত্রব্যবস্থাকেই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কিন্তু সমাজ-পতি বা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের আধিপত্য গ্রাহ্য করে না। ফরাসীবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শ এই যুক্তি-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রথমে এই যুক্তি-বাদকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁর ধর্ম্মপ্রবণ বুদ্ধি প্রথমাবধিই এই সাম্য-মৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শকে স্বল্প-বিস্তর ভীতির চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করে। এই সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার নামে য়ুরোপের ইতিহাসে যে পাশবলীলার অভিনয় হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া, যাহাতে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে একান্ত প্রতিষ্ঠালাভ না করে, কেশবচন্দ্র সর্ব্বদাই প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইতে না হইতেই য়ুরোপীয় মনীষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসীবিপ্লব যে

সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জাগাইয়া তুলে, কিন্তু এ সকলের চিরন্তন বিরোধ নিষ্পত্তির কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ফরাসীবিপ্লব স্বাধীনতার নামে একটা ঐকান্তিক অনধীনতার ভাবকে জাগাইয়া জনসমাজকে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্নই করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজের ও সেই সমাজান্তর্গত অপরাপর ব্যক্তির যে নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া সমাজের ঘন-নিবিষ্টতা সাধনের কোনও পন্থার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগে প্রাচীনকে ভাঙ্গাই ফরাসীবিপ্লবের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল, এই বিপ্লব সেই কর্ম্মই সাধন করিয়া যায়; কিন্তু নবযুগের নব আদশের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রেমের ও বিশ্বজনীনতার উপরে গড়িয়া তোলা তার কাজও ছিল না, সে কাজ ফরাসী-বিপ্লব করিতেও পারে নাই। ফরাসী-বিপ্লবের নিকটে আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা যে অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও, এইজন্য ইতালীয় মনীষী ম্যাজিনী (১৮৩৫) ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সংশোধন করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধতর আস্তিক্যবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত হিউম্যানিটার (Humanity) উপরে, আপনার স্বদেশচর্য্যা বা Nationalismকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই উন্নত আদশের উপরেই ম্যাজিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে যুন ইতালীয় সমাজের বা Young Italy Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (Carlyle) Hero Worship নামক প্রবন্ধে এক নূতন মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফরাসীবিপ্লবের সাম্যবাদের মূল ভিত্তিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মসমাজকে এই বিপ্লবাত্মক যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র আগ্রহাতিশয় সহকারে কার্লাইলের মহা-পুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্লাইলের মহাপুরুষবাদেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ঈশ্বরতন্ত্রের বা Theocracyর মতকে যুক্ত করিয়া দিয়া, এক নূতন প্রেরিত-মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হ'ন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ বা Great Men সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করেন। এইখানেই, প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের কৃতবিদ্য যুক্তিবাদী যুবকদলের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অনুগত প্রচারকগণের বিরোধ আরম্ভ হয়।

শিবনাথের চরিত্র

এই বিরোধের সূত্রপাত অবধিই শিবনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় দলের মুখপাত্র ও অগ্রণী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী অবস্থাতেই, তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কৃতবিদ্য যুবকগণ যেরূপভাবে কেশব-চন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আত্যন্তিক শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, শিবনাথ সেরূপভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনাবধিই শিবনাথের মধ্যে এই আত্যন্তিক শ্রদ্ধার ভাব অত্যন্তই অল্প ছিল। শিবনাথের পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও, অতিশয় বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন।— আর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার যোগ এ জগতে অত্যন্ত বিরল। বিশেষতঃ যেখানে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে সুরসিকতাও বিদ্যমান থাকে, সেখানে শ্রদ্ধা

ফুটিয়া উঠিবার অবসর মাত্রই প্রায় পায় না। যেমন তাঁর পিতৃচরিত্রে, সেইরূপ শিবনাথের নিজের প্রকৃতিতেও একদিকে প্রখর ধীশক্তি ও অন্যদিকে উচ্ছ্বসিত রসিকতা এই দুইই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম যৌবনে তাঁর বিচারশক্তি ও বিদ্রূপ-প্রবৃত্তি যতটা ফুটিয়াছিল, শ্রদ্ধাশীলতা যে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁব সে কালের প্রবন্ধাদি ইহারই সাক্ষ্য দান করে। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবনাথের মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সঙ্গে তাঁরও কতকটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আর সে সময়ে সোমপ্রকাশে শিবনাথের যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে তাঁর এই যুক্তিপ্রবণতার ও বিদ্রূপাসক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে"—

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ,"

প্রকাশিত হইলে, সোমপ্রকাশে শিবনাথ তাঁহার অনুকরণে যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন, তাহাতেই তাঁহার উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্রূপাসক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণও তাহা পড়িয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্‌ভক্তও নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিকও নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী

সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশেব ধৰ্ম্মচিন্তায় ও কৰ্ম্মজীবনে তিনি যা’ কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবিপ্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের ও সমাজজীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তার বাগ্মিতাশক্তি ও সাহিত্য-সম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনও প্রকারের অনন্যসাধারণ সাধনসম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুচবিহার বিবাহোপলক্ষে যাহারা কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ’ন, তাঁহাদের অনেকে তখনও পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই বিশেষভাবে আপনাদিগের নূতন ধৰ্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও এই দলেব সঙ্গে যোগদান করেন সত্য; কিন্তু একদিকে কেশবচন্দ্রের আপনার শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার এই কার্য্যের একান্ত অসঙ্গতি এবং অন্যদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অপর প্রচারকগণ কেশবচন্দ্রের পক্ষ-সমর্থনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অন্তর্নিহিত ওকালতী-বুদ্ধি-সুলভ সত্যগোপনের এবং অসত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই দুই মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ধৰ্ম্মনিষ্ঠাতে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। আর ব্রাহ্ম-সমাজের ধৰ্ম্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান্ ও রক্ষণশীল সভ্যদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিজয়কৃষ্ণকে আচার্য্যপদে বরণ করেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই ইঁহাদিগের ধৰ্ম্মজীবনের বা কৰ্ম্মজীবনের

অধিনেতৃত্বলাভ করেন নাই। ফলতঃ নূতন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিজয়-কৃষ্ণের ভক্তযশের সাহায্যে আপনাদিগের বিদ্রোহিদলের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যতটা উৎসুক ছিলেন তাঁহার সাধু চরিত্রের এবং অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ততটা উৎসুক ছিলেন না। এই কারণেই বিজয়-কৃষ্ণের সাধু চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধমূল হইবার অবসর পায় নাই এবং তাহারই জন্য সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন পরে অত্যন্ত সরাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের সমাজের সর্ব্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে পারিয়াছিলেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী না হইয়াও কেবল আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতা গুণে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার অধিনায়কত্ব লাভ করেন।

য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াও অনেকে ক্রমে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, আপনাদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্তে ও ধর্ম্মসাধনে এই যুক্তিবাদকে স্বল্প বিস্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনিও তাহা করেন। তাঁহার অনুগত শিষ্য মণ্ডলীও এই যুক্তিমার্গ বর্জ্জন করিয়া এক প্রকারের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা যুক্তিপ্রবণতা আছে, যাহাকে যতই ছাড়াইতে ইচ্ছা করুন না কেন, এ পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যুক্তিপ্রবণতা মূলতঃ ইংরেজিতে যাহাকে Scepticism বা অতিসন্দেহবাদ বলে,

তাহারই রূপান্তর মাত্র। আর শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে সর্ব্বদাই যেন এই বস্তুটী লুকাইয়া থাকে। তিনি অনেক সময় আস্তিক্য-বিরোধী সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, আর তখন প্রথমে যথারীতি সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁর এই সকল বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিরোধী সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা বিশদ ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি যে ভাবে এ সকলের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান, তাহা সেরূপ বিশদ এবং সদ্যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া উঠে না। এই কারণে তাঁর ধর্ম্মোপদেশে যুক্তিবাদী শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণে ধর্ম্মের মূল ভিত্তিগুলিকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দেয়, সে পরিমাণে আবার কিছুতেই তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। আর এই সাংঘাতিক অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে যে কতকটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে, ইহা তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি এবং মায়াময়ী কবিকল্পনারই ফল।

কিন্তু ইহাতে শিবনাথ বাবুর কোনই গৌরবের হানি হয় না। তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠা কিম্বা ভক্তিপন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য বিধাতাপুরুষ তাঁহার সৃষ্টি করেন নাই; করিলে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি অন্য ছাঁচেই গঠিত হইত। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কতকগুলি পূর্ব্ববৃত্ত সাধন আছে। আর মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সংস্কার-চেষ্টা কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শিবনাথ বাবুই এই সকল পূর্ব্ববৃত্ত সাধনে ব্রাহ্মসমাজের এবং কিয়ৎপরি-মাণে দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদলের গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, সেই শুদ্ধ-চিত্তেই কেবল পরমতত্ত্বের সার্থক অনুশীলন সম্ভব হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে বিচারযুক্তি, তার পরে, সর্ব্বশেষে, এই বিচারযুক্তির ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা

হইলে, সন্দেহের একান্ত নিরসন হইয়া, প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার,—এই ভাবেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধাই, এজন্য, ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান ও মূল ভিত্তি। আর এ কালের অনেক বাঙ্গালী ও ভারতবাসী শিবনাথ বাবুর শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া, সন্দেহ, বিচার, প্রভৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আস্তিক্য-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে তার নায়কত্বে "না"এর পথ বাহিয়া গিয়া, পরে "হাঁ"এর রাজ্যে যাইয়া পৌছিয়াছেন। আর ইঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিয়া বা তাহার বাহিরে যাইয়া, নিজ নিজ সাধনশক্তির দ্বারা যে দিকে ও যে পরিমাণে দেশের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতেছেন, তার জন্য এদেশের বর্ত্তমান সাধনা কিয়ৎ-পরিমাণে শিবনাথ বাবুর নিকটে ঋণী রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষির সময়াবধি ব্রাহ্মসমাজ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা 'Freedom'এর আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনস্রোতের মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মহর্ষি কিংবা তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র কিংবা তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ, ইহাঁদের কেহই শেষ পর্য্যন্ত সেই সংকল্পের উপরে দৃঢ়ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই; পারিলে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মমীমাংসায় ও কর্ম্মজীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনই স্থান হইত না। কিন্তু মহর্ষি এবং কেশব-চন্দ্র উভয়েই, প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মকে বর্জ্জন করেন, সেই যুক্তি ও বিচারের উপরে, সর্ব্ববিধ ফলাফল-ভাবনা-বিরহিত হইয়া, বিশ্বাস বা সাহস ভরে, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া

থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা দুইজনেই স্বদেশের ধর্ম্মের ও সমাজের সনাতন ভিত্তিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের নূতন সমাজে ধর্ম্মের নামে নাস্তিক্যবুদ্ধি ও স্বাধীনতার অজুহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র অরাজকতার অভ্যুদয় দেখিয়া, একান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া, নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মেব অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিবোধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষিব ভাঙার ভিতরেও, তাঁর প্রকৃতিতে হিন্দু-আস্তিক্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতাব গুণে, কতকটা সংযম বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইনি যে উপায়ে আপনার কর্ম্মের মন্দফলকে নিরস্ত কবিতে চেষ্টা কবেন, তার মধ্যেও কতকটা সংযতভাব ছিল। কেশবচন্দ্রের ভাঙার অন্তরালে হিন্দুর আস্তিক্যবুদ্ধি বা রক্ষণশীলতা ছিল না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান্ কনফর্ম্মিষ্ট-স্বভাব-সুলভ উদ্ধত অহংবুদ্ধি ও উদ্দাম সংস্কার চেষ্টাই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাঁব ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে সেরূপ কোনও সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব আদৌ ছিল না বলিয়া, তিনি যে উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামেব প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও অত্যন্ত উদ্দাম ও অসংযত হইয়া উঠে। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়া, আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই দাবীর অন্তবালে একটা সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে, কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের সমক্ষে তাঁর অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী জাহির করিয়াছেন এবং মানবেতিহাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে যেমন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত

করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার "প্রেরিত-মণ্ডলী" সেইরূপই বর্ত্তমান যুগের "নববিধানকে" প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন, নানাদিকে ও নানাভাবে, এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাগত গুরুপরম্পরাশ্রিত সাধনমার্গ সকলকে অভ্রান্ত নয় বলিয়া সর্ব্বপ্রকারের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা ভ্রষ্ট করিয়া, নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্য সেই মর্য্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহা শুনিবে কেন? মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রেব এই অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও সভ্য স্বীকার করিলেও আধুনিক ভারতসমাজে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই; কখনও যে হইবে, তারও কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশের ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজ যে জটিল সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ তার কোনও মীমাংসার পথ দেখাইতে পারেন নাই।

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই সমস্যাকে মীমাংসার দিকে লইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কিংবা কেশবচন্দ্র যে তাহাও পারেন নাই—জনসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রাচীন অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, একথাও অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে। ফল যেমন পরিপূর্ণ পক্কতা প্রাপ্ত হইলে, আপনিই গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া, আবার নূতন ফসলের সূত্রপাত করে; সেইরূপ যে সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমস্যার উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া আপনারাই নিজেদের ভিতরকার সত্য ও অসত্য, যুক্তি ও যুক্ত্যাভাস, কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ করিয়া তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে নূতন ও অপ্রচলিতের একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যের ভূমি প্রকাশিত হইয়া, সেই যুগ-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসার পথটী দেখাইয়া দেয়। এই সকল চিন্তা,

ভাব ও আদর্শ আপনাদের যথাযথ পরিণতি লাভ করিয়া পূর্ব্বে, কোনও কোনও দিকে তাহাদের অসঙ্গতি বা অমঙ্গল ফল দেখিয়া, যিনিই অকালে কোনও যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইবেন, তাঁহার সে মীমাংসা যে অপূর্ণ ও অযৌক্তিক, উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্ভট হইবে, ইহা অনিবার্য্য। প্রশ্নটা পরিষ্কাররূপে অভিব্যক্ত হইলেই তো তার সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। ইংরেজি শিক্ষা ইংরেজের শাসন, য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শ, এই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মজীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে, মহর্ষির কর্ম্মচেষ্টা বা কেশবচন্দ্রের জীবনযাত্রা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, তার সম্যক্ ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। সুতরাং মহর্ষি বা কেশবচন্দ্র যে এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলতঃ কেবল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণই যে ইহার সদুত্তর দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করেন, তাহাও নহে। একদিকে যেমন কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে সেরূপ দয়ানন্দ স্বামীর আর্য্যসমাজ, অল্‌কট্‌—ব্লাভ্যাটস্কীর থিওসফী সমাজ এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি-প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানকারিগণ, ইঁহারা সকলেই আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত "সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার" আদর্শে আমাদের নব্যশিক্ষিত সমাজে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় ও আচার আচরণে কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ জনগণের ভিতরেও যে যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও শক্তি অনুসারে এই অভিনব বিপ্লবস্রোতের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। আর বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস এই সমুদায় চেষ্টারই নিষ্ফলতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

আর এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, একদিকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার এবং অন্যদিকে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের ও প্রাচীন

সমাজের মূল প্রকৃতি যে কি, এ জ্ঞান ইঁহাদের কাহারই ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি অল্‌কট্‌ ব্লাভ্যাট্‌স্কী, কি শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি,—ইঁহাদের কেহই দেশের লোক-প্রকৃতি, সমাজ-প্রকৃতি কিংবা পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার প্রকৃতির উপরে, অথবা আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা যে পথে আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে মীমাংসা বলা যায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার প্রথমে কতকগুলি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মত, সিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকে। কোনও কারণে এ সকলে সত্য বা কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নূতন মত বা সিদ্ধান্ত, ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচারের বা যথাযোগ্য-প্রমাণপ্রতিষ্ঠা-সমালোচনার বা criticismএর আবশ্যক হয়। এই বিচার ক্রমে নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ-নিষ্পত্তির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পথে যাইয়াই পরিণামে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হয়। এরূপ মীমাংসার জন্য বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সম্যক জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র, কি থিওসফী সমাজের নেতৃবর্গ, কি তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানকারিগণ, ইঁহাদের কেহই এ জ্ঞানলাভ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের স্বদেশের মূল প্রকৃতির এবং বিশেষতঃ স্বজাতির ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের কোনও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। থাকিলে তিনি খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ান্‌ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া, বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইতেন না। হিন্দু যুগে যুগে, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের মধ্যে যে সামঞ্জস্য

প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির নিত্য বিরোধকে মিটাইয়াছেন এবং এইরূপে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও দেববাদ হইতে ক্রমে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মতত্ত্ব; উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আধ্যাত্মিক কল্পনাভূষিত পৌরাণিকী ভক্তিপন্থার ভিতর দিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, পন্থাবিভাগ ও অধিকারি-ভেদের সাহায্যে, আপনার ধর্ম্মের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যেই সনাতন বিশ্বধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছেন,—কেশবচন্দ্র স্বদেশের সাধনার এই অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্বটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তাঁর অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক কল্পনাবলে তিনি যে ত্রিবিধ যোগপ্রণালীর বর্ণনা করেন,* তাহাতে মানবসমাজের ধর্ম্মের ও সাধনার ইতিহাসের সাধারণ বিবর্ত্তন-তত্ত্বটী অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু স্বদেশের সাধনার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনপ্রণালীর বিচার করিবার সময়, কেশবচন্দ্র সম্যগ্‌রূপে এই তত্ত্বটী প্রয়োগ করেন নাই বা অকালে দেহত্যাগ করিয়া, করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ একরূপ অন্তিমদশায় আসিয়াই তিনি এই যোগ-তত্ত্বটী লাভ করেন। তাঁর "নব-বিধান" ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার একটা উদ্ভট মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। আর সে মীমাংসার প্রতিষ্ঠায়, কেশবচন্দ্র স্বদেশের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া, খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ানী অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেন। তাঁর প্রেরিত-মহাপুরুষ-বাদ ঈশ্বরানুপ্রাণতা-বাদ ও শ্রীদরবার, এ সকলই ইহুদীয় ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে এ সকলের কোনই সম্পর্ক নাই। আর ইহাই কেশবচন্দ্রের মীমাংসা-চেষ্টার

---

* Yoga : Objective, Subjective, and Universal.

নিষ্ফলতার কারণ। কেশবচন্দ্রের মীমাংসার চেষ্টা যেমন খৃষ্টীয়শাস্ত্রে ও খৃষ্টীয়ান্ ইতিহাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়বাদ বলা যাইতে পারে;* সেইরূপ দয়ানন্দের আর্য্যসমাজের, অল্‌কট্‌ ব্লাভ্যাট্‌স্কীর থিওসফীর এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য হিন্দুগণের মীমাংসাও বস্তুতঃ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবেই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্‌কট্‌ ব্লাভ্যাট্‌স্কীর তো কথাই নাই, দয়ানন্দ স্বামী বা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও স্বদেশের ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগসমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল মীমাংসাই প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও লৌকিক ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সকল অকাল-চেষ্টিত মীমাংসার নিষ্ফলতার প্রধান কারণই এই যে, এ সকলে যে সমস্যা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে সমস্যাটীই নিঃশেষভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াই, তার মীমাংসার পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও, নিজেদের পূর্ব্বঅর্জ্জিত সাধন-সম্পৎ-প্রভাবে, আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বে বা ধর্ম্মসাধনে শুদ্ধ স্বানুভূতি ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে নিজেরাই শাস্ত্র-প্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর অধিকার গ্রহণ করেন। মহর্ষির জীবদ্দশায়

* কেশবচন্দ্রের "নববিধানের" একটা হিন্দু দিক্‌ও আছে, এখানে তার কথা বলিতেছি না।

তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ সকল বিষয়েই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পরেও নববিধানসমাজ তাঁরই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। এই সমাজে গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকৃত না হইলেও, একটা প্রবল পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সমাজের ধর্ম্মকে ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার আতিশয্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের শিক্ষার গুণে এই দলের ব্রাহ্মগণ এক প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং সাধুভক্তির অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে এমন একটা সংযম ও শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যাহা শিবনাথ বাবুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ক্বচিৎ কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেও, সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে দেখা যায় না। একদিকে শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি নাই। অন্যদিকে নববিধান-সমাজের 'প্রেরিত মণ্ডলী'র ও 'শ্রীদরবারে'র মত কোনও পৌরহিত্যের প্রতিষ্ঠাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই। নববিধান-মণ্ডলীর শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুভক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এ সমাজের কোনও কোনও আচার্য্য ও প্রচারক 'মৃত সাধুদের' চরিত্রের অনু-শীলনের উপদেশ দিয়া, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া, জীবিত সাধুদের সঙ্গ করা নিষেধ করিয়াছেন,—এমনও শোনা যায়। সুতরাং শিবনাথ বাবু তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে যুক্তিবাদী ধর্ম্মের নিজস্ব স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজে, বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আজি পর্য্যন্তও ততটা ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ

কিন্তু শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও স্বাভাবিকী ও বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি না থাকিলেও, সর্ব্বদাই একপ্রকারের ধর্ম্মানুরাগ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই ধর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয়। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ এই জাতীয় কি না, সন্দেহ। ইহাকে বিলাতী ছাঁচের ধর্ম্মানুরাগ বলিয়াই মনে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে Religious Enthusiasm বলে। এই ধর্ম্মানুরাগ দুই দিক্ দিয়া প্রকাশিত হয়। একদিকে ইহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য একটা গভীর আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারগ্রহণ, প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার বাসনার ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠে। অন্যদিকে লোকহিতেচ্ছা এবং লোকসেবার চেষ্টাতেও ইহা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগবদ্ভক্তির কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ অনেকটা এই জাতীয়। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি যে কি, বলা সহজ নয়। প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি তাঁর নাই। শিক্ষার প্রভাবে গভীর তত্ত্বালোচনার দ্বারাও যে তিনি তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া, গুরু-শক্তিসঞ্চারেও তাঁর ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আলোচনায় লৌকিক ন্যায় যে কারণ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করে, কেবল সেই ব্রহ্মের জ্ঞানই কতকটা তাঁর আছে মাত্র। আর কবি-প্রকৃতি-সুলভ ভাবাবেগ হইতে এই লৌকিক-ন্যায়-প্রতিষ্ঠিত কারণ-ব্রহ্মেতে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি মহদ্‌গুণের অধ্যাস হইয়া, শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মে একপ্রকারের ঈশ্বর-কল্পনাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে স্বদেশের এবং সমগ্র মানবজাতির সুখ ও উন্নতি-কামনা-প্রসূত একটা প্রবল কর্ম্মানুরাগও তাঁর জীবনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগতের

সর্ব্বত্র, এই সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম্ম বা Rational Religion গড়িয়া উঠে।

ফলতঃ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শে আমাদের সেকালের ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারই উপরে শিবনাথ বাবুর এই ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যৌবনাবধিই, কতকটা বৈজিক-নিয়মাধীনে, আর কতকটা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে, শিবনাথ বাবুর ভিতরে একটা অদম্য অনধীনতার ভাব জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে য়ুরোপীয় ঝাঁঝের একটা বলবতী মানবহিতৈষাও মিশিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই বাল্যাবধি এমন একটা নিঃস্বার্থতা এবং মহা-প্রাণতাও ছিল, যাহাতে এই মানবহিতৈষাকে বাড়াইয়া তুলে। এই অনধীনতার ও মানবহিতৈষার প্রেরণাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া মনে হয়। লোকসেবাই তাঁর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ছিল। অনধীনতার ভাব হইতেই দেশপ্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের কর্ম্মবহুল অনুষ্ঠানাদি ও প্রাচীন শাস্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্জ্জন করেন। মানবহিতৈষা হইতেই স্বদেশের জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। য়ুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়ই, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্ম্মের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তার মনুষ্যত্ব বস্তুকে অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্য, শিবনাথ বাবুর যে আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহর্ষির কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই। তথাকথিত সাম্যমৈত্রীস্বাধী-নতার উপরে পরিবারের ও সমাজের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজাস্বত্বের সম্প্রসারণে, এক সময়ে শিবনাথ বাবু ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার প্রভাব, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি

ফরাসীয় চিন্তানায়কগণের শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া সাক্ষাৎভাবে শিবনাথ বাবু-বা তাঁর সহযোগী ব্রাহ্মগণের উপরে আসিয়া পড়ে নাই। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তিবাদী খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের শিক্ষা-দীক্ষা হইতেই আমাদের ব্রাহ্মসমাজ য়ুরোপীয় 'সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতা'র উদ্দীপনা লাভ করেন। আর ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফ্রান্সেস নিউম্যান্ এবং আমেরিকার থিওডোর পাকারের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ বাবুর প্রথম যৌবনকালে পার্কারই ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী যুবকদলের প্রধান শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির উপরে পার্কারের ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁর ভারতবাসী শিষ্যগণ সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন কি না, সন্দেহের কথা। শিবনাথ বাবু প্রভৃতি পার্কারের দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা প্রবৃত্তি এবং উদার ও বিশ্বজনীন মানব-প্রেমের উদ্দীপনাই কতকটা লাভ করেন, কিন্তু পাকারের তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা সহজ নয়।

ফলতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইবার পূর্ব্বে শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা কর্ম্মোৎসাহই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপাসনাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর যতটা উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল, সমাজ-সংস্কারে তখন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহ ছিল, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে তিনি উপাসনা-প্রার্থনাদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনকেও যে লৌকিক ন্যায়ের বিশুদ্ধ তর্কযুক্তির কষ্টিপাথরে কসিতেছিলেন, তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী"ই ইহার সাক্ষী। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগত প্রচারকগণ যে শিবনাথ বাবুর সে সময়ের ধর্ম্মভাবকে বড় বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, ইহাও জানা কথা। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য-সাধন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াসী হইলে, শিবনাথ বাবু তাঁর এ সকল

মত ও আদর্শকে লোকচক্ষে কতটা হীন করিবার চেষ্টা করেন, তখনকার “সোমপ্রকাশে” এবং “সমদর্শী”তে তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ও অতিলৌকিক দিক্‌টা যে শিবনাথ বাবুর নিকট প্রকাশিত হয় নাই, এ সকলে ইহাই প্রমাণ করে। ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে, শিবনাথ বাবু ‘বিবেক’ ‘বৈরাগ্যা’দি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু এ সকল কতটা যে তাঁর ভিতরকার সাধনাভিজ্ঞতা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কতটা যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফল, ইহাও বলা সহজ নয়। আর এ সকল সত্ত্বেও শিবনাথ বাবুর জীবনে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াস অপেক্ষা, বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াস যে সর্ব্বদাই বলবত্তর হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ শিবনাথ বাবুর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বস্তুগুলি তাঁর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের ভিতর দিয়া আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শিবনাথ বাবু কবি। রসানুভূতি কবিপ্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রসগ্রাহিতা ও ভোগলিপ্সা শিবনাথ বাবুর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই দুই বস্তুই তাঁর প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের চরিত্রের যে দিক্‌টা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার পাইয়া, তাহা ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সত্য-সন্ধিৎসাই সে সময়ে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই সত্য-সন্ধিৎসা যুক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন কি নূতন কোনও প্রকারের বন্ধন যুক্তিবাদ সহ্য করিতে পারে না। যুক্তিবাদ সত্যের সন্ধানে যাইয়া ভুল ভ্রান্তি যাই করুক না

কেন, কখনও লোকানুবর্ত্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গার্য়ডিণো ব্রুণো প্রভৃতি য়ুরোপীয় যুক্তিবাদিগণ সত্যের সন্ধানে বা প্রচাবে প্রাচীন শাস্ত্র বা প্রচলিত পৌরোহিত্য কোনও কিছুরই মুখাপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই, সেখানে যুক্তিবাদ এতটা প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শিবনাথও এক সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়া আপনার বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেন, প্রাচীন সমাজের আনুগত্য পরিহার করিয়া তিনি কিছুতেই তখন নূতন সমাজেব প্রচারকমণ্ডলীর বা আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্য নূতন সমাজের কর্ত্তৃ-পক্ষীয়দের হাতে শিবনাথকে অশেষপ্রকারের নির্য্যাতন এবং লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের প্রচারকগণ শিবনাথের যে সকল দুর্নাম রটনা করিয়াছিলেন, কোনও কোনও ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আজি পর্য্যন্ত তাঁর স্মৃতি জাগিয়া আছে। এই নিগ্রহ-নির্য্যাতনে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের শক্তি ও সৌরভ যতটা ফুটিয়াছিল, সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইয়া তাহা হয় নাই। বরং এই অভিনব দায়িত্বভাব তাঁহার আপনাব অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাকে নানা দিকে চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহার মূল চরিত্রের সম্যগ্রূপে ফুটিয়া উঠিবার বিশেষ ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে।

যোগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম শিব-নাথ বাবুর মধ্যে কখনই বেশী ছিল না ; এখনও নাই। ফলাফল-বিচার-বিরহিত সত্যসন্ধিৎসা, দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা-প্রবৃত্তি, অকৃত্রিম লোক-হিতৈষা এবং প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ,— এ সকলই শিবনাথ বাবুর .প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই সকলের জন্যই তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমা-জের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদারমতি যুবকদলের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত

ও ধর্ম্মসাধনাকে সর্ব্বপ্রকারের অতিপ্রাকৃতত্ব ও অতিলৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী" যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কেশবচন্দ্র যখন ক্রমে একটা কল্পিত যোগবৈরাগ্যের আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ও সোজা ভাবগুলিকে স্বল্পবিস্তর জটিল ও কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছেন, তাঁর নূতন শিক্ষাদীক্ষাব প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যখন সংসাব-ধর্ম্মের সহজ ভাবগুলি একটা কৃত্রিম পারলৌকিকতার উৎপাতে ম্রিয়মাণ হইতে আরম্ভ করে, পাবিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্র যখন কেবল আপনিই সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে হীন বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শিবনাথই ব্রাহ্মসমাজেব সে আদিকার অনধীনতা ধর্ম্মের পুরোহিত ও রক্ষক হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজে অবরোধপ্রথা তুলিবার চেষ্টায় রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তখন শিবনাথই এই উন্নতিশীলদলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবাবণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন, জাতি-ভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এ সকল বিষয়ে শিবনাথই তখন বাংলার সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী যুবকদলেব নেতা হইয়া উঠিতেছিলেন। আর সর্ব্বোপরি তিনিই, রাজা রামমোহন রায়ের পরে, ব্রাহ্মধর্ম্মেতে একটা উদার ও প্রবল স্বদেশপ্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজ একরূপ প্রথমাবধিই যে সার্ব্বজনীন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, শিবনাথ বাবু যে ভাবে ও যে পরিমাণে সেই আদর্শটীকে এক সময়ে ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই তাহা করেন নাই বা পারেন নাই।

শিবনাথ বাবুর স্বদেশহিতৈষা

দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধনে এবং কেশবচন্দ্র পারিবারিক জীবনেই মুখ্যভাবে এই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্ব্ব-প্রথমে ইহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হন। এই জন্য শিবনাথ বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এ বস্তু এতটা পরিস্ফুটভাবে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এই জন্যই শিবনাথ বাবুর প্রথম জীবনে তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের মধ্যে একটা সুন্দর সঙ্গতি ও শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভার ফলে, তাঁর ধর্ম্ম-জীবনে ও কর্ম্মজীবনে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিন চালচলনেও একটা নটস্বভাবসুলভ কৃত্রিমতা বিদ্যমান ছিল। এই 'নাটুকে' ভাবটা শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময় একেবারেই ছিল না বলিয়া, গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনলাভ না করিয়াও, তিনি অনেক সরল ধর্ম্মপিপাসু লোকেরও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই অ্যারিষ্টক্রেট (aristocrat) ছিলেন। জীবনব্যাপী ধর্ম্মসাধন এবং ধর্ম্মচর্চ্চাও ইঁহাদের এই আভিজাত্য-অভিমান নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবনাথ বাবুর কোনও আভিজাত্যের দাবীও ছিল না; আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই এক সময়ে একটা ঐকান্তিক নিরহঙ্কারের ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া, তিনি বাঙ্গলা সমাজে নানাদিকে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেও, কখনও কোনও রূপ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন নাই। আযৌবন তাঁহাকে ডিমোক্র্যাট (Democrat) রূপেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আর এই ডিমোক্রাসীর বা গণতন্ত্রতার আদর্শ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের ও কর্ম্মজীবনের সকল বিভাগকেও অধিকার করিয়াছিল বলিয়া,

যে স্বদেশপ্রীতি মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মজীবনে প্রকাশিত হয় নাই,—শিবনাথ বাবুর মধ্যে তাহা অতি বিশদরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেবশচন্দ্র ব্রহ্মোপাসনাকালে সমুদায় জগতের কল্যাণের জন্যই প্রার্থনা করিতেন। আর এই রীতিটী তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সঙ্ঘের (Church of England) উপাসনা-পদ্ধতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তকে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কোন সঙ্গীত কখনও দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। শিবনাথ বাবুই প্রথমে—

তব পদে লই শরণ।
আর্য্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি,
অবসন্ন আছে, অচেতন হে।
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা আঁধার তাব কর মোচন।
কোটী কোটী নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।—

—এই স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গান ব্রহ্মসঙ্গীতভুক্ত করিয়া দেন।

কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্ব্বে শিবনাথ বাবু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া একটী নূতন কর্ম্মিদল গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটীকে তিনি যে আদর্শে গঠন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে শিবনাথ বাবুর অন্তরের সত্যভাব ও আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশপ্রীতিই এই দলগঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই, শিবনাথ বাবুব সে সময়ের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পারিবারিক স্বাধীনতা—জীবনের সর্ব্ববিভাগে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্ম্মের অনধীনতার আদর্শটাকে ফুটাইয়া তোলাই, শিবনাথ বাবুর এই কর্ম্মিদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেন্দ্রনাথের আদিব্রাহ্মসমাজে, কি কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে এই অনধীনতার আদর্শটাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথ বাবু ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক বা কর্ম্মনায়ক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই নিজস্ব আদর্শটীকে এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভাব ও আদর্শগুলি যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, মহর্ষি কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা করে নাই। মহর্ষি এই ধর্ম্মের বীজমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে কতকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ বাবুই এক সময়ে ইহাকে পরিস্ফুট ও পরিপক্কভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, ইহাই তাঁর জীবনেব ও কর্ম্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু আত্যন্তিকভাবে এই আদর্শটীকে লোকচরিত্রে ও সমাজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একান্তরূপে তার নিজের

প্রকৃতির উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। অনধীনতার আদর্শের চরম পরিণতি দার্শনিক রাজকতায়। য়ুরোপে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Individualistic Freedomএর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক অরাজকতাতে বা Philosphical Anarchismএতে যাইয়া পৌছাইয়াছে। আপনার যুক্তির সূত্রটী ধরিয়া চলিলে, শিবনাথ বাবুকে এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও পরিণামে এইখানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত। আর ইঁহারা যে এতটা দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, তাহাতে ইঁহাদের কাহারই যে একান্ত কল্যাণ হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাসভরে, অনন্যচিত্ত হইয়া, ফলাফল-বিচার পরিহার পূর্ব্বক, যে কোনও সিদ্ধান্ত বা পন্থাকে ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত বা সেই পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই, ক্রমে পরমতত্ত্বে ও চরম গতিতে যাইয়া পৌছাইতে পারে। যুক্তিবাদী ধর্ম্মও এইজন্য, আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে, পরিণামে যাইয়া পরমবস্তু লাভ করিয়া থাকে। আর সাধনের মধ্য-পথের আকস্মিক ও মায়িক ভয়বিভীষিকার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্ম-সমাজ একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা সহকারে, নিজের সিদ্ধান্তকে আঁকড়িয়া ধরিতে পারে নাই বলিয়াই, এমন ভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্বে শিবনাথ বাবু যে বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, এই নূতন সমাজের নেতৃপদের গুরুতর দায়িত্ব-ভার-গ্রস্ত হইয়া, ক্রমে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর এই জন্যই, ভয়াবহ পরধর্ম্মের চাপে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতিকে অযথা নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া, শিবনাথ বাবু নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর তাঁর সমাজকেও আত্মচরিতার্থতা লাভে সাহায্য করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা—একদিক্

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করিয়া, বাঙ্গালী আজ আপনাকেই লোক সমক্ষে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। কোনো জাতির যখন আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, তখন তারা এইরূপ করিয়াই আপনাদের সমাজের মহৎলোকদিগের মহত্ত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে আপনাদিগকে বাড়াইয়া তুলে। যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে আপনিও যোগ্যতাভ্রষ্ট হইয়া রহে। বাঙ্গালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া গিয়াছিল। যোগ্যের সম্বর্দ্ধনা যে সমাজের একটা অতি প্রধান কর্ত্তব্য, বাঙ্গলার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাঙ্গলার সে আত্মবিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্দ্ধনাও তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—আর এক দিক্

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজসিক সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধ্যেই লালিত-পালিত, সেবিত-বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি "প্রিন্স্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর বংশের কুল-প্রদীপ। বাঙ্গলার বুনিয়াদী

ও ইংরেজের বানানো রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ সংসারে অতি বিরল। এই শুভযোগ না হইলে আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর দ্বারা যে সমারোহসহকারে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেরূপ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেন কি না সন্দেহের কথা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অগৌরবের কথা কিছুই নাই। যেখানেই নানা ভাবের, নানা চরিত্রের, নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত হইয়া, একসঙ্গে কোনো পূজা-অর্চ্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ ভাবের খিচুড়ী পাকিয়া যাইবেই যাইবে। এ ক্ষেত্রে কখনো সকলে এক ভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অর্চ্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, কেহ বা তাঁর গুণে বশ হইয়া আসে; কেহ বা স্বার্থের সন্ধানে কেহ বা পরমার্থের অন্বেষণে আসে। আর কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, শুধু যজ্ঞের জনতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই পূজাস্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বারা কুত্রাপি উপাস্যের যোগ্যতার কোনো হানি হয় না। যিনি যে ভাবেই রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিন না কেন, তাঁর ভাব তাঁহাকেই কেবল ক্ষুদ্র বা মহৎ করিয়াছে, তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে। এ যোগ্যতা তাঁর কৌলিক ধনমর্য্যাদার নহে। এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তাঁর পৈত্রিক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয় ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী যোগ্যতার সম্বর্দ্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল

আমাদেরই হীনতা প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্রপ্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যকে যাহারা এই কালে অভূতপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভক্তিকে, বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীব ধর্ম্ম ও বাঙ্গালীর কর্ম্মকে যাঁরা ইদানীন্তনকালে নানা প্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ যে তাঁদের অগ্রণীদলভুক্ত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাক্তার যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে এদিক ওদিক দিয়া, অনেক অপূর্ণতা খুঁজিয়া পাইবেন, জানি। বাঙ্গলার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্দ্রের প্রতিভার সমালোচনা করিলে, তিনি তাঁদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ সকল কথা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাঙ্গলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা ও স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ হইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের সাধনা ও সমাজের আদর্শ সর্ব্ববাদীসম্মত হওয়া সম্ভবই নহে। এ সকল মতান্তর অনিবার্য্য। কিন্তু এ সকল খণ্ডতা দ্বারা কোনো মাহয়সী প্রতিভার বিচার-বিবেচনা হয় না, হইতেই পারে না। কোনো কিছুরই সত্যকে তার আংশিকতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপের যাচাই করিতে হইলে যেমন তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখা হয় না; রূপ-বস্তুটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথক্‌ভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না;

নাক, কাণ, চোক, হাত, পা, কটি, চুল, রং এ সকল খুঁটিনাটি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার ঠিক মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভব হয় না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদিগের অলৌকিক প্রতিভার বিচারও সেইরূপ সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হয়। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ওজন করিতে গেলে, সত্যিকার বস্তুটা যে কি ও কত বড়, তাঁর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। যারা খুঁটিনাটি ধরিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার-আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁরা কদাপি সে প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্র কবি। রবীন্দ্র ঋষি। রবীন্দ্র শক্তিশালী লেখক। রবীন্দ্র জনপ্রিয় লোকনায়ক। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রবীন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসর কাল, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। ঋজু কুটিল ভাবে, তির্য্যক্ গতিতে, তাঁহার জীবন ও কর্ম্মস্রোত এই পঞ্চাশবৎসর কাল এক নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। তিনি নানা সময়ে নানা কথা কহিয়াছেন। নানা মত প্রচার করিয়াছেন। নানা আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ তাঁর জীবনে ও চিন্তায় ভাবে ও কর্ম্মে, এই সকল বিভিন্ন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহা সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছে, সে বস্তু এক, বহু নহে। সে বস্তুর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক। সেই স্বরূপেই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রের প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তার এই ভিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

আর আপনার স্বরূপে রবীন্দ্র জ্ঞানীও নহেন, কর্ম্মীও নহেন, কিন্তু শুদ্ধ কবি। এই কবি বস্তু যে কি, তাহা দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মুখে বলিয়া

বোঝান সহজ নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা যাইতেও বা পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্যরচনায় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য সত্য কবি নাও হইতে পারেন। চোকে যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখা ; কাণে যাহা শোনা যায় না, তাহাই শোনা ; যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ করা, আর এ সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রতক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়া, এক অভূত অদ্ভুত ভাব-জগতের সৃষ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম্ম। প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখেন, আর এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির প্রাণ। এই জন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শ-নিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক্ দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এরূপ সম্যকদর্শন নিষ্প্রয়োজন। আমরা আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি, যাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়বিজ্ঞান মাত্র, এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই সর্ব্বথা এগিয়ে দেয়। জ্ঞাতার নহে, কিন্তু জ্ঞেয়ের প্রকৃতি ও গুণাদির পরীক্ষা করাই এই বিজ্ঞা-নের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিজ্ঞানও জ্ঞেয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। এই পথে যে ভাবের যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক তারই অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নহে। কবি বস্তুর ভিতরকার গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু বস্তু-সাক্ষাৎকারে তাঁর আপনার অন্তরে কোন্ রসের কতটা উদ্রেক হইল, তাহাই দেখেন ও আস্বাদন করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তু-তন্ত্রতা

চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্য বস্তু-তন্ত্রতাব একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, বিষয়-জগতে। কবির অধিকার ভিতরে, অন্তর্জগতে। বৈজ্ঞানিক বহির্ম্মুখীন ও বিষয়াভিমুখীন। কবি অন্তর্ম্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মানুভূতি, এই সকলই কবি-প্রতিভার স্বরূপ। এই স্বরূপলক্ষণ যে কবিব কবিত্বে যতটা বেশী প্রকাশিত হয়, তাঁর কবি-প্রতিভাকেই সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা

এই কষ্টিপাথব দিয়া পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাঙ্গলার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে। শব্দ-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্য্যেও তাঁর সমকক্ষ কিম্বা তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডী দাসের পরে, বাঙ্গলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কালধর্ম্ম বশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসারতা ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথে সে প্রসারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্য দিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব-কবিদিগের অপেক্ষা হীন

বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্ম্মপিপাসা প্রবল। সাধনের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবিপ্রতিভার স্ফূরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। ধর্ম্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁর সকলি বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাঁর আপনার সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীনযুগের প্রমুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই। প্রাচীন ধর্ম্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে—চৈত্য গুরুরূপে; অপর বাহিরে—মোহান্ত গুরুরূপে। এই জন্যই তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্ম্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুরই স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলেন, তাঁর স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্যপ্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকেই আপনার ইন্দ্রিয়বিকার প্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া, ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎ প্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়,

তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্যপ্রকাশ ও মোহান্তপ্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থন ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই ভিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। বৈষ্ণবসাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে বলিয়া, বৈষ্ণবকবিগণ একান্ত অন্তর্ম্মুখীন হইয়াও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণবকবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধন গুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে একান্তভাবেই অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ম্মুখীনতা

যে ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্ব্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে। একদিক দিয়া একান্ত অন্তর্ম্মুখীন প্রতিভা যেমন আপনার ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহাতেই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, অন্যদিকে সেইরূপ সর্ব্বদাই একান্তভাবে বাহিরের প্রেরণারও অধীন হইয়া রহে। একান্ত অন্তর্ম্মুখীন প্রতিভা সত্যের একদেশমাত্র প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়া নহে, কেবল ভিতর লইয়াও নহে। বাহির ও ভিতর, সত্যের এই দুই অঙ্গ। এই দুই অঙ্গে সত্য পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা আকস্মিক নহে, অঙ্গাঙ্গী। একটাকে ছাড়িয়া, অপরটাকে ধরা সম্ভব নহে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এ কথা যেমন সত্য; যাহা পাই না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এ কথাও তেমনি সত্য। ভাণ্ডকে

ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়া ভাণ্ড শূন্য, নিরাকার। আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। দুইএর কোনোটাকেই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অন্তর্ম্মুখীন বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল ভাণ্ডেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; ব্রহ্মাণ্ডের বা বহি-বিষয়ের প্রামাণ্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না। ইহার ফলে মতে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোনো প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থায় পরিণামে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্ব্বজনীনতা রাখা তখন একান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্ব্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতাই এ পথে সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাহ্যপ্রেরণার অধীনতা

কিন্তু মানুষ যতই কেন অন্তর্ম্মুখীন হউক না, কিছুতেই সহজে বাহি-রের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদান্তিক সাধনে বাহিরের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পথ সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রশস্ত, গৃহীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পথে চলিতে গেলে, যথাসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন করা আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথ সে পথের পথিক নন। "ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্"—তাঁর জীবনের ধর্ম্ম বা আদর্শ নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্রনাথ এখন সংযমী, কিন্তু কখনো সন্ন্যাসী ছিলেন না। সুতরাং বাহিরের সম্পর্ক ও প্রেরণা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই। আর

এই জন্যই ক্ষণে ক্ষণে বহির্বিষয়ের তাড়নায়, বাহিরের অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে, এক একবার রবীন্দ্রনাথের মনগড়া জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় ও তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া জীবনের সমস্যাভেদে নিযুক্ত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর পিতার চরিত্রের ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রভাব

এই ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্ম্মসংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিত্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে একান্ত ভাবেই প্রাকৃত বুদ্ধিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতারই ফল। এই অন্তর্ম্মুখীনতার আতিশয্য হইতেই, ইংরেজীতে যাহাকে Subjective individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরেই বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যারা শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁদের পক্ষে এই Subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্রও মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্ম্মের প্রামাণ্য শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে শাস্ত্রপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, রামমোহন সেরূপ শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিতেন না, সত্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষি-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তেও এইরূপ

অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে প্রাচীন ঋষি পন্থা অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে, সুশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও স্বানুভূতি এই তিনের একবাক্যতার উপরেই সত্যের ও ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরেই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আর শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ব্যক্তিগত মতামতে ও সার্ব্বভৌমিক সত্যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্ম্মের প্রেরণাতে যে বস্তুতঃ কোনই প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে, আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরঙ্কুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন। মহর্ষি প্রথম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ জীবনে আপনার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ভগবৎ প্রেরণাতেই সঙ্কলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত শ্রুতিসকলের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরানুপ্রাণিত, মহর্ষি ইদানীং বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার শিষ্যমণ্ডলীর স্বানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বে সমাজে অরাজকতার ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া, শেষে আপনিই "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই "নবসংহিতা" হিন্দুর মনুসংহিতার

ন্যায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আছে। কিন্তু এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি বা Subjective individualism এর প্রভাব এখনো অপ্রতিহত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ও সমাজ

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা Subjective individualismএরই রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈত্রিক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্ম্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে শিক্ষা ও সাধনা লাভ কবেন নাই। কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজ একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। সহরের সমাজে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রমুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না। সকলেই আপন আপন সংসার ও স্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করিবার অবসর পায় না। যাদের অন্নচিন্তা নাই, সঞ্চিত ধন যাঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিকা-উপার্জ্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁবাও কেবল আপনার সমশ্রেণীর ধনীজনের সঙ্গেই আলাপ আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁদেব জন্মিতেই পারে না। পল্লীসমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, এবং এই জন্য যেরূপ একটা মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় সহরে, বিশেষ আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্তই অভাব হয়। এই মেশামেশির অভাবে কলিকাতার বড়লোকদের পক্ষে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা একরূপ

অসম্ভব ও অসাধ্য। ইঁহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশ পথ নাই। জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইঁহাদের কোনো প্রবেশ পথ নাই'। চারিদিকের দীনদরিদ্রেরা কিরূপে দিনপাত করে, তাদের সংসারের সমস্যা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন্ দিক দিয়া, কি ভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনীসম্প্রদায় তার কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁরা আপনাদের ত্রিতল-প্রাসাদের ছাদ হইতে গরীবের খোলার চালা ও মাটীর দেয়াল মাত্র দেখেন। ঐ চালার নীচে, ঐ দেয়ালের মাঝখানে, ঐ ক্ষুদ্র, জঞ্জালময়, কুটীর প্রাঙ্গণে, কত আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও কত ত্যাগ যে দিনরাত্রি কত ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে জীবে ও শিবে কি যে মাখামাখি, কি যে লীলাখেলা, কি যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে, এ সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাঁহাদের হয় না। তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের, ভাবের, ভোগের, বিলাসের, সখের ও সৌখীনতার জগৎটাই তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার বাহিরে যে বিশাল সমাজ পড়িয়া আছে, সেটা তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী-সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে, তাঁর পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী-সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রের উদার প্রাণ, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশবই এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে বিহার ও বিচরণ করিয়াছে। তাঁর আপনার পরিবারের দুচারটী প্রাণের সঙ্গেই রবীন্দ্রের প্রাণের প্রত্যক্ষ ও সত্য যোগাযোগ ছিল। এই

গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরেই রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে, সত্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ শতবঞ্চগালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিয়া, মানস-চক্ষে কর্দ্দমমর্দ্দিত পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কণবপু, সুমার্জ্জিতরুচি, স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অলৌকিক কবিপ্রতিভার এ অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়িক প্রভাব সর্ব্বত্রই থাকে। আর এইরূপ মায়িক সৃষ্টির এমন একটা মোহিনীশক্তিও থাকে, যাহাতে মানুষকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে যে, সত্যিকার সুখদুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্ব্বদা সকলকে সেরূপভাবে মাতাইয়া তুলিতে পারে না। কল্পনার তুলিকায় দারিদ্র্যদুঃখ অঙ্কিত করিয়া, সেই চিত্র-সহায়ে দারিদ্র্যের মধুটুকুই আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা আমাদের গায়ে বিঁধে না। উৎকৃষ্টতম তৈলচিত্র যেমন কতকটা দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হয়, একান্ত নিকটে গেলে, বর্ণের বন্ধুরতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জন-চিত্র সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকলেরই মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে ভালটুকুই আমরা অনেক সময় দেখি, মন্দটুকু চক্ষে পড়ে না! এইজন্য দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনো কখনো ধনীও যে আপনার বিষয়ের দুর্ভাবনায় ও প্রতিদিনের জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একান্ত পীড়িত

হইয়া, পর্ণকুটীরের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপদৃষ্টি প্রেরণ করেন না, এমনো নহে। কিন্তু প্রমোদপ্রাসাদ হইতে কল্পনার দূরবীক্ষণসহায়ে, দূরস্থিত পর্ণকুটীরের অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণকন্থার কীটানুলীলা ও শীর্ণদেহ, দীর্ণপ্রাণ কুটীরবাসীদিগের কলহ-কোলাহল প্রত্যক্ষ কবিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না। বস্তু সংস্পর্শে এই কল্পিত জগৎ চক্ষের পলকে মায়াপুবীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়।

আমি এ কথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভাব কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথেব উপরেই ন্যস্ত ছিল। এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গলার পল্লীজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসরও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগ নিবন্ধনই যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর "বাবুদের" সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামিশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা লালসা ধর্ম্মপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, আপনার আচারব্যবহারে ও সন্তানগণের শিক্ষাদীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবধানটাকে ঘুচাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাও জানি। কিন্তু এ সকল সাধুচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতা মাত্রই প্রকাশিত হয়,

সে সকল চেষ্টার সফলতা তো আর সপ্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতিলাভ কোনো পক্ষেরই সহজ নহে। বিশেষতঃ পাদ্রিজনসুলভ সৌহার্দ্দ্য ও বিশ্বমানবীপ্রেমে কিছুতেই এরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মানো সম্ভব হয় না। এ আত্মবিস্মৃতিলাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মূল্যটা ভুলিতে হয়, জ্ঞানীকে জ্ঞানের প্রাধান্যটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার উপাসককে ললিত-লালিত্যের সুকুমার অনুভূতিটা ভুলিতে হয়, আর ধার্ম্মিককে অপরের ধর্ম্ম হইতে আপনার ধর্ম্মটা যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাবটা পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিব্যবস্থা আপনা হইতেই ধনী ও নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত না জন্মায়; যেখানে সামাজিকজীবনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে ও নিরভিমানসহকারে মেশা-মিশি করেন না; যেখানে বিজ্ঞেরা আপনাদের বিজ্ঞতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গেই খৃষ্টীয়কথাপ্রসিদ্ধ সেণ্ট্ সাইমনের মত, দিবানিশি বসিয়া রহেন, অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞের সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর লাভ করেন না; যেখানে ধার্ম্মিক একচক্ষে আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারা-দির শ্রেষ্ঠতা ধ্যান করেন, আর অপর চক্ষে অন্য সম্প্রদায়সকলের সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির হীনতা দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন;—সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট করা কেবল অসাধ্য যে তাহা নহে, চেষ্টামাত্রেই যে ব্যবধানকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহাকেই আরো বাড়াইয়া তোলে। এই জন্য এই শতাধিক বৎসরের অশেষ চেষ্টাতেও মার্কিণ সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক ব্যবধানটা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং এই সাধুচেষ্টারই ফলে শ্বেতকৃষ্ণে

বাহিরের আইন কানুনের বৈষম্য যে পরিমাণে কমিতেছে, ভিতরকার মনের ব্যবধানটা যেন সেই পরিমাণেই আরো বাড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহারই অঙ্কে, তারই দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিনই আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে প্রজার কুলের আদর, না আছে তার বিদ্যার গৌরব, না আছে তার চরিত্রের মর্য্যাদা। মহর্ষির জমিদারীতেও এ সকলের কোনো বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে তাঁহাদের জমিদারীতে যে সকল জমিদারী আচার-নিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তার কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যতদিন প্রজাবর্গের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রজাত্বের অগৌরব বিস্মৃত হইয়া, একান্ত প্রমুক্তভাবে জমিদারবাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভবই নয়। আর প্রজারা যতদিন না এ অকুণ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন কেবল জমিদারের উদারতায় বা বিশ্বমানবপ্রেমে পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক ব্যবধানটা কিছুতেই ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য্যসাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাঙ্গলার পল্লীজীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের মায়িক সৃষ্টি ও মায়াশক্তি

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই এইরূপ মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন

আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে "গোরা"র হারাণ বাবুটী অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াস ও ধর্ম্মের শিক্ষাও বহুলপরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহারই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। আশৈশবই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবেই নয়, আজি পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল "বিশ্ব-মানব" কল্পনা করিয়া তাহারই উদারপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষেও নয়, আগমেও নয়, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই।

এ সংসারে মায়াধীন জীব নিত্যই, পাই পাই পাই না, ধরি ধরি ধরিতে পারি না ;—এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই চিরলোলুপ ও নিত্য-অতৃপ্তভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক সময়ই চিত্তকে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানের, ভাবের, কর্ম্মের পিপাসা বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সন্দর্ভ সকল সর্ব্বদাই কাণে মধু ঢালে, প্রাণে গিয়া সাড়া দেয়, বুদ্ধিকে যাইয়া জাগাইয়া তোলে, কিন্তু পাঠককে ক্বচিৎ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ একবার "ততঃ কিম্?" নামে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁর নিজের লেখাতেও প্রায় সর্ব্বদাই ঐ দুর্দ্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্ব্বদাই বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু সর্ব্বদাই আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ারই ধর্ম্ম।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ঋষিত্ব—ভাব ও অভাব

কিন্তু রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্ব্বদাই মায়িক। অশরীরীকে শারীরধর্ম্মে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়কে নামরূপ দিয়া জ্ঞানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাকেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াধর্ম্ম বলে। কবি-প্রতিভা যে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও; সাধনা বলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরেই আপনার

কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরমপদলাভের অনেক যোগ্যতাই আছে, অভাব কেবল এক বস্তুর। যে বস্তুর অভাব পূরণ করিবার জন্য যিশু যোহনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর-পুরীর শরণাগত হন, যে সঞ্চারের অভাবে অধ্যাত্মজীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও তাহা কদাপি ফলপ্রসূ হয় না, রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্তুর। এই সঞ্চারের অভাবেই রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াতীত সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিতে পারিতেছে না। য়ুরোপপর্য্যাটনে না যাইয়া রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের পুণ্যতীর্থভ্রমণে আজ বাহির হন, তবে হয় ত, ভগবৎপ্রসাদে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো 'সাধুবৈদ্যের' সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এ অভাব পূরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ না হউক, এক দিন এ অভাব তাঁর পূর্ণ হইবেই হইবে। তাঁর ক্ষয়োন্মুখ সংসার বেশি দিন তাঁহাকে মনগড়া সিদ্ধান্তের এবং কল্পিত সংস্কারের মায়াজালে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।

অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মিলন

[বঙ্গদর্শন—বৈশাখ, ১৩২০]

চট্টগ্রামের সাহিত্যসম্মিলন অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া অতি ভাল কাজই করিয়াছেন। আজ অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যজগতে একটা পুণ্যস্মৃতির মতন হইয়া পড়িয়াছেন বটে, আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকেরা বা বাঙ্গলা লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব যে অনুভব করিয়া থাকেন, এমন বলা যায় না। কিন্তু ইহা এই জগতেরই চিরন্তন বিধান। পুরাতন সর্ব্বত্রই ক্রমে চলিয়া যায়, তার স্থলে নূতন আসিয়া অভিষিক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে পুরাতনের মর্য্যাদা কোনও মতেই যে কমিয়া যায়, তাহাও নহে। নূতন পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজের প্রাণের মূলে, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে সাক্ষী চৈতন্য বিরাজিত আছে, সে জানে পুরাতনের পুরাতত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়াই নূতনের যাবতীয় শক্তি-সাধ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই ইতিহাস সর্ব্বদা সকল স্থানেই পুরাতনের সমধিক পক্ষপাতী হয়। সম্যক্-দর্শী সুধীগণ, এই কারণেই, সর্ব্বদা প্রাচীনের প্রতি ভক্ত্যবনত হইয়া থাকেন। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনী অক্ষয়চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া এই সম্যক দর্শন ও এই ভক্তিপ্রবণতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান কোথায় ও স্থায়িত্ব কতটুকু হইবে, বলা সহজ নহে। অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার কিম্বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী আছে, এমনও বলা অসম্ভব। কিন্তু যেমন চূড়াতেই মন্দির নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ কেবল অলোকসামান্য প্রতিভা বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তির দ্বারাই কোনও সাহিত্য বা সমাজ-জীবনও

গড়িয়া উঠে না। বহু বস্তুর সাহচর্য্যে, বহু শক্তির সমবায়ে, বহু গুণের সম্মিলনে, দুনিয়ার যত কিছু ভাল জিনিষ সকলই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ ছোট বড় বহু সাহিত্যিকের সমবেত চেষ্টা ও শক্তি দ্বারাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এক-জনই হয়েন। কিন্তু তাঁর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকেন। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়াই তিনি তাঁর যোগধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা একান্তই অঙ্গাঙ্গী, কোনও মতেই আকস্মিক নহে। বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষাতে, বাঙ্গালীর চিন্তাতে ও ভাবেতে, আদর্শে ও চরিত্রে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রেরণায় আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ আপনার নিয়তি-পথে চলিতেছে। এরূপ শক্তি-সঞ্চার রাজা বামমোহনের পবে, এক কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ করেন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা করা সর্ব্বদা সঙ্গত নহে। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দু'জনার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ প্রশ্ন তোলাই অন্যায়। বাঙ্গালী দু'জনার নিকটেই সমভাবে ঋণী। ইহারা মূলে একে অন্যকেই সাহায্য করিয়াছেন। পরস্পবে পরস্পরের আদশ ও প্রেরণাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমনই বা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র কি বঙ্কিমচন্দ্র দুই মহাপুরুষের কেহই আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গকে ছাড়িয়া এ কাজটী করিতে পারিতেন না। প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতিকে একদিকে ও এক সময়ে কেশবচন্দ্র যেমন আপনার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রেরণার দ্বারা ফুটাইয়াছিলেন, ইহাঁরাও সেইরূপ আপন আপন সাধনসম্পত্তি দিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ জগতে একাকিত্বের

মধ্যে মৃত্যুর অবসাদই কেবল পাওয়া যায়, জীবনেব প্রেরণা মিলে না। যেমন কেশবচন্দ্র আপনার সাঙ্গোপাঙ্গগণের গুণেই এত বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ, আধুনিক বাঙ্গলাসাহিত্যক্ষেত্রে, আপনার সহচর ও সহযোগিগণের শক্তি ও সাধনাকে আশ্রয় ও আত্মসাৎ করিয়াই এমন অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেন। যে সে লোক আপনাব উপযোগী লোক বাছিয়া লইয়া, নিজের পার্শ্বে টানিয়া আনিতে পারে না। আর যে সে লোক আপনার পারিপার্শ্বিক শক্তি ও সাধনাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করিয়াও লইতে পারে না। এরূপভাবে যাহারা দুর্লক্ষ্য সূত্রে চারিদিক হইতে উপযোগী সহচরদিগকে আপনার কাছে টানিয়া আনিতে পারেন ও টানিয়া আনিয়া তাহাদের মধ্যে আপনাকে ও আপনাব মধ্যে তাহাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পারেন, তাঁরাই সত্য সত্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজটা যেমন ভাবে ও যতটা পরিমাণে করিয়াছিলেন, এমন আব কেহ কবিতে পাবেন নাই। বোধ হয় এ আকর্ষণী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রাজা রামমোহনেরও ছিল। তিনিও কতকগুলি প্রতিভাশালী লোককে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে' কালের ভিতরকার খবর আমরা তেমন জানি না। রাজার প্রখর প্রতিভার আওতায় পড়িয়া তার সমসাময়িক প্রতিভাশালী বাঙ্গালীগণের প্রতিভা লোক সমাজে আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র না কি কতকটা আমাদেরই সময়ের লোক; তাকে দেখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের সমগ্র ইতিহাসটাই একরূপ আমাদের চক্ষের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদিগের সকলকে না হউক, অনেককে আমরা স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবেই দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, আর সেই জন্যই বাঙ্গলা দেশটা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের

অলোকসামান্য প্রতিভার নিকটে ঋণী, সেইরূপ তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির নিকটে কতটা পরিমাণে যে ঋণী ছিল, ইহার সংবাদও আমরা কতকটা রাখিয়াছি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তবঙ্গদের মধ্যে, অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলেই অবসর মত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ কবিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সে কালেব বঙ্গদশনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেকটা বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে তাহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে এমন করুণ কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না, সন্দেহ। "মালঞ্চনিবাসিনা মধুসূদন সরকারস্য"কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। আর আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়েব "হেলেনা কাব্যের" ভূমিকায় যে অত্যুক্তি ছিল. তাহার প্রতি বঙ্গদশন যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিল,—সে বিদ্রূপের মধ্যে কতবিধ রস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। ফলতঃ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাঙ্গলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। নব পর্য্যায় বঙ্গদশনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সে পুরাতন স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলেন; কিন্তু সচরাচর আজ বাঙ্গলাসাহিত্যে সমালোচকের ধর্ম্মাসনে

তেমন একটীও যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরেজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গলাসাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরিভাবে সাহিত্যসমালোচনার প্রবৃত্তি এবং রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে এখন অনেকস্থলে সমালোচকের পদে মোসাহেব অধিষ্ঠিত। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা বাস্তবিকই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকেব এই অবনতিধারা প্রত্যক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা এক সময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তাব মূল্য ও মর্য্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও, ভাষার একটা অনন্য-সাধাবণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এ বস্তুটী তার নিজস্ব। কবিতা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দসম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য লেখাতে অক্ষয়চন্দ্র সে সম্পদেরই প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টি-কুশলতায় বাঙ্গলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নকলনবিশ অনেক হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হয়েন নাই, সকল সময়ে যে অক্ষয়চন্দ্রের শব্দ প্রবাহ ঠিক সার্থক হয় তাহা নাও বা বলা যাইতে পারে। সে ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যে নাই, এমন কথাই কি বলা যায়? কিন্তু শব্দের যে একটা নিজস্ব মোহিনী প্রভাব আছে, সুযোজিত ধ্বনিধারার যে একটা মাদকতাসঞ্চারিণী শক্তি আছে, এও তো সত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই, রসাত্মক বাক্য যোজনা করিতে যাইয়া, স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এই মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তিকে

উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। এ অধিকার যাঁর নাই, তিনি চিন্তাশীল হইতে পারেন, বহু জ্ঞানের অধীশ্বর হইতে পারেন, বহু তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাও হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে পারেন না। স্বর্ণকারের ব্যবসায় যেমন টাকা কড়ি লইয়া, সাহিত্যিকের ব্যবসায় সেইরূপ শব্দ লইয়া। যার যে পরিমাণে টাকা কড়ি চালাইবার ক্ষমতা থাকে, সেই যেমন স্বর্ণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজনপদবাচ্য হয়; সেইরূপ যে লেখকের শব্দ-সম্পদ যত বিশাল ও সেই শব্দরাশির যথাযোগ্য যোজনায় নিপুণতা যাঁর যত বেশি, সাহিত্যজগতে তিনি তত শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এই হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রকে ন্যায়তঃই সাহিত্যাচার্য্য বলিতে পারা যায়। বাঙ্গলা গদ্যরচনায় এমন তুবড়ী ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এ জগতে সকল বস্তুরই উপযোগিতা যত কমিয়া আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে উপকারিতাও ক্রমে কমিয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীটা আজ হয়ত ঠিক তেমন ভাবে আর উপযোগী নহে। দেশের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। বস্তুজ্ঞান জন্মুক আর নাই জন্মুক, বস্তু-লাভের আকাঙ্ক্ষাটা বেশই জাগিয়া উঠিতেছে। লোকচিত্ত এখন শব্দের মোহিনী মায়া কাটাইয়া গভীরতর ভাবে অর্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্রমে এ ভাবটা বাঙ্গলা সাহিত্যেও স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য বাঙ্গলা গদ্যের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে বদলাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যের শক্তি এককালে ধ্বনিগত ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে চিন্তাকে, গবেষণাকে, যুক্তি-বিচারকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে লেখার অন্তরালে চিন্তার জোর আছে, তাহাই এখন শক্তিশালী লেখা বলিয়া গণ্য হয়। কেবল ভাবের, রসের, শব্দের ফোয়ারার উপরে সাহিত্য-সম্পদ ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তির

প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব নহে। এই কারণে অক্ষয়চন্দ্র যে গদ্যরচনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও আজিকার বাজারে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। আজিকার বাঙ্গলাসাহিত্যে গদ্য-রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পর অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কি কালীপ্রসন্ন, ইহারা সকলেই সাহিত্যে মহারথী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গলাভাষায় গদ্য রচনার ক্ষমতাটা যে কত বড়, ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনটা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাঁদের কেহই তেমনটা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন নিরেট গাঁথুনী বাঙ্গলা-ভাষার শক্তিতে যে সম্ভব ইহা লোকে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমক্ষে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্য-সাহিত্যসৃষ্টি আজ অনেকটা মলিন হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তিনিও যে বাঙ্গলা শব্দকে লইয়া বিচিত্ররসের খেলা খেলিয়াছিলেন, আর সে খেলাতে বাঙ্গালী চকিত, পুলকিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সে জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে আজিও অক্ষয়চন্দ্র অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ভোগ করিতেছেন। তবে তাঁর গদ্যের আদর্শটা যে আজি কালি লোকচক্ষে কতকটা হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃ অক্ষয়চন্দ্রেরও দোষ নহে। দোষ তাঁর অনুকরণকারীদের। ইহাঁদের না ছিল অক্ষয়চন্দ্রের ধারণা, না ছিল তাঁর চিন্তার শক্তি বা রসানুভূতির প্রাখর্য্য,—ছিল কেবল কাণ। তাই তাঁহারা কেবল কাণের জোরে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীর অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। অকৃতি অথচ গুরুমর্য্যাদালোলুপ শিষ্যের হাতে পড়িয়া অনেক গুরুরই যেমন দুর্দ্দশা ঘটে, শিষ্যের আতিশয্য দেখিয়া লোকের গুরুর প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, অক্ষয়চন্দ্রের অকৃতি অনুকরণকারীদের হাতে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভারও সেই দশা ঘটিয়াছে। এ উৎপাতের আবির্ভাব

না হইলে আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের পূর্ব্ব স্থান বজায় থাকিত।

অন্যান্য দেশে জ্ঞানালোচনার জন্য বড় বড় সভা-সমিতি আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল রাষ্ট্রীয় কোলাহল লইয়াই বিব্রত ছিলাম। দেশের অন্যান্য অভাব ও অভিযোগের, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টার প্রতি দৃক্‌পাত করিবার অবসর ছিল না। এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ অনবধানতা দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাহা দেখা যায় নাই. বোম্বাইএ বহুকাল হইতে, গ্রীষ্মের প্রাক্কালে, একটা করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে দেশের মনীষীগণ বিবিধ বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল সভাতে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করেন, মান্দ্রাজেও কিছুকাল হইতে এই পদ্ধতিটী প্রচলিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতিবর্ষে বসন্ত সময়ে, কোনও পর্ব্বাহকে আশ্রয় করিয়া এক একটা বিদ্বজ্জন-সমাগম হয়। এবারে এই উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের এ সকল সভা কতকটা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ এসোসিয়েষণের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করি নাই। কিন্তু বিগত কতিপয় বৎসর হইতে বাঙ্গলা-সাহিত্য-সম্মিলন সেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ এই বার্ষিক সম্মিলনটীকে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ও সাধনার একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিবেন, চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে, কাব্যের রাজ্যে,

মৌলিকগবেষণায় ও রসসৃষ্টিব্যাপারে, দর্শনে, ইতিহাসে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে, সমস্ত জীবনের ও স্বজাতির সাধনার বিবিধ বিভাগে, বৎসর কাল মধ্যে আমরা কতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি, কোন্ দিকে কতটা নূতন চেষ্টা হইয়াছে, কোন্ দিকে কতটা সংশোধন আবশ্যক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এইরূপে ইংরেজ মনীষীসমাজে ব্রিটিশ এসোসিয়েষণ যে স্থানটা অধিকার করিয়া আছে, বাঙ্গলার সুধীমণ্ডলীমধ্যে আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলন ঠিক সেই স্থানটী অধিকার করুক, এই দিকেই এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটীকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ, হয় ত ইতিমধ্যেই, এইভাবে এই সাহিত্য-সম্মিলনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর যারা এই আদর্শ মনে লইয়া চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যবিবরণের বিচার আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তারা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে কিয়ৎপরিমাণে নিরাশ হইবেন না, এমন বলিতে পারা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের বঙ্কিম যুগের এক জন প্রধান কর্ম্মী। তাঁর চক্ষের উপরে বাঙ্গলায় এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে এ যুগের জন্ম কর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। আমরা তাঁর নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের ভিতর কার বিকাশের ইতিহাসটা শুনিব, আশা করিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শন প্রথমে বাঙ্গলা দেশে ও বাঙ্গলাভাষাতে যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলে, তার পরে ক্রমে সেই ভাব, সেই শক্তি, সেই চিন্তা, পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর আপনার "নব জীবনে" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচারে" যে আকার ধারণ করে, কেমন করিয়া বঙ্গদর্শনের প্রথম বয়সের বহির্ম্মুখীনতা ক্রমে আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া তুলে, এবং ক্রমে পুনরায় আত্মস্থ হইয়া, নিজের মধ্যে ফিরিয়া

আসিবার জন্য লালায়িত হয়, কেমন করিয়া একদিকে "নবজীবন" ও অন্য দিকে "প্রচার" এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাসরূপে বাঙ্গলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তারপর ক্রমে আজ সেই প্রত্যাবর্ত্তনই পূর্ণতর, গভীরতর, বিশদতর আকারে, সমধিক সত্যোপেত হইয়া, এক বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে আসিয়া দাড়াইতেছে—বাঙ্গালীর প্রাণপণের এই চল্লিশ বৎসরের এই পবিত্র পুরাণ-গাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্জয়-রূপে, বাঙ্গলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আজ এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁবা তাঁর চট্টগ্রামের অভিভাষণটা পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু এ হতাশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকলে সকল কাজ করিতে পারে না। বঙ্কিমযুগের সাহিত্য-সমালোচনার কাজ এ বয়সে অক্ষয়চন্দ্রেব পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি একটা কাজ করিতে পারিতেন। কেবল এবারতের দিক দিয়া চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের গঁতি কোন্ দিকে, ভাল কি মন্দ, উন্নত না অবনত হইয়াছে, এ কথাটা অক্ষয়চন্দ্র যেমন ভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন, তেমনভাবে উপদেশ দিবার শক্তি ও অধিকার বাঙ্গলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আর কাহারও বড় বেশী আছে কি না সন্দেহ। এই এবারতে—ইংরেজীতে ইহাকে style বলে,—অক্ষয়চন্দ্র এক সময়ে অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তো, বলিতে গেলে দু'চার জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখাতে ভিন্ন এবারত বস্তুটাই বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলাসাহিত্যের যে অপকার করিতেছেন সাহিত্য-সম্মিলন হইতে তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল। আর অক্ষয়চন্দ্রের এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবার যতটা অধিকার আছে, আর

কোনও জীবিত সাহিত্যিকের সে অধিকার নাই। অক্ষয়চন্দ্র এ বিষয়ে যে একেবারেই কোনও আলোচনা করেন নাই, তাহাও নহে। কিন্তু আলোচনাটা আরো গভীর, আরো পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এবারতের বা styleএর একটা দিকমাত্র দেখাইয়াছেন। ভাষা প্রাণময়ী হইবে। দেশের, অর্থাৎ দশের প্রাণবস্তু সংস্পর্শে ভাষা আপনার প্রাণশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের প্রাণের চাবিটী হাতে লইয়া, সাহিত্যিককে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কথাটা খুবই সত্য। তোড়ায় বাঁধা ফুলের ক্ষণিক রূপ যতই থাকুক না কেন, প্রাণগত রস যে নাই, ইহা সকলেই জানে। ধার করা কথাও কতকটা এইরূপ। তার রস থাকে না, দুদণ্ড পাঠককে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্নিগ্ধ করিবার শক্তি তার থাকে না। ইংরেজ ক্লান্ত হইলে, ক্লিষ্ট হইলে, 'ডিয়ার' 'ডিয়ার' বলিয়া হাই তুলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডিয়ার কথাটা খুবই মিষ্টি হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা 'মা' বলিয়াই হাই তুলি, গা ভাঙ্গি, দুঃখক্লেশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। এই 'মা' কথাই আমাদের প্রাণ জুড়াইবার সঙ্কেত। এখানে প্রিয় বলিলেও চলিবে না, জননী বলিলেও চলিবে না। 'মা'ই বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবের রাজ্যে, প্রাণের রাজ্যে, ভিতরকার আদানপ্রদানের ব্যবসায়ে, দেশের ও দশের চিরাভ্যস্ত প্রাণের কথাগুলি ব্যবহার করিতেই হইবে, না করিলে, বাঙ্গলাসাহিত্য ও বাঙ্গলাভাষা একটা জীবন্ত বস্তু আর থাকিবে না। রস-সাহিত্যে—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে,—এই প্রাণের ভাষার সেতুকে আশ্রয় করিয়া দেশের প্রাণের সঙ্গে একটা জীবন্ত যোগ রাখিতেই হইবে। এখানে জলধরপটলসংযোগে কোনও রূপ-রসের বর্ণনাতে রসভঙ্গ হইবেই হইবে। নিতান্ত পরের ধনে পোদ্দারি করিয়া যে সকল ভুঁইফোড় লেখক

সহসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা দিগ্‌গজ খ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁরা ছাড়া, আর কোনও কবি, বা ঔপন্যাসিক, বা নাটককার, বোধ হয় এ উদ্ভট চেষ্টাও করেন না।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এ ছাড়াও যে সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, ইহা যেন তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন, মনে হয়। ভাষা ভাবের বাহন। ভাবে অশেষবিধ বৈচিত্র্য থাকে। কোনও একটা রসকে ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কখনও ঐশ্বর্য্য, কখনও মাধুর্য্য ; কখনও বীভৎস, কখনও বাৎসল্য ; কখনও রুদ্র, কখনও করুণ। এখন প্রশ্ন এই যে দেশের ও সমাজের নিম্নস্তরে এ সকল বিবিধ রসের প্রকাশ যথাযোগ্য ভাবে ভাষায় হয় কি ? রসের যন্ত্র ভাষা নহে,—স্নায়ু ও পেশি। অশিক্ষিত চাষী যখন রুদ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন তার হাতের ও বুকের পেশি সকল ফুলিয়া উঠে, তার চক্ষু জবাফুলের মত হয়, মুখভাব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে ;—কিন্তু রুদ্ররসের উপযোগী শব্দ-প্রবাহ সে ফুটাইয়া তুলিতে পারে কি ? হদ্দমুদ্দ "আয় তো শালা" বলিয়া সে বাক্যস্ফোট করিয়া ছুটিয়া যায়। আচ্ছা, এই চিত্রটী সাহিত্যে ফুটাইতে গেলে, নিতান্ত সহজ, গ্রাম্যজন-বোধসুলভ ভাষায় কি তাহা সম্ভব হইবে ? সমাজের নিম্নস্তরের অন্তরটা শিশুর মতন ; তাদের ভাষাও স্বল্পবিস্তর শিশুরই ভাষা—আধ আধ। তাদের মুখে ঐ ভাষাতে সকল রসই ফুটিয়া উঠে, আর ফুটিয়া উঠে, কেবল শব্দ সহায়ে নয়, কিন্তু মুখের ভাবে, চলনের বা দাঁড়ানর ভঙ্গীতে। পুস্তকে তো আর এই সকল আনুসঙ্গিক রসগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিতে গেলে, হয় এ সকলের লিপিচিত্র আঁকিয়া তুলিতে হইবে, না হইলে, যে-রস ইহারা কতকটা কথায়, কতকটা হাবেভাবে প্রকাশ করে, সেই রসের উপযোগী ভাষা

ব্যবহার করা প্রয়োজন। অক্ষয় বাবু যে এ সকল কথা জানেন না, বা বুঝেন না, এমন অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা কল্পনাও করি না। কিন্তু তিনি এই অভিভাষণে এদিকে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই বলিয়া, এবারতের বা styleএর সমালোচনা হিসাবে তাঁর বক্তৃতাটী অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আর এবারতের বা styleএর সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র যে দিকটা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র, ক্ষেত্র বিশেষেই তাঁর বিধান শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানিয়া চলিতে গেলে ভাষার গতির দিকটা, উন্নতির দিকটা, জটিলতার ভিতর দিয়া যে কলাকুশলতা প্রকাশিত হয়, সেই প্রাণহারী জটিলতার দিক্‌টা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, এমন কথা বলিতে পারি না; অক্ষয়চন্দ্রের মতন এমন সুকৃতি লেখক নিজেও এ কথা বলিবেন, বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ ছাড়া এবারতের আর একটা দিক্‌ও আছে। সে দিক্‌টার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও অক্ষয়চন্দ্র কোনও উপদেশ করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষার এবারতটা বাঙ্গলায় হইবে, আর কোনও দেশের হইবে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কথাটা যে কত বড়, সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিকও ইহা ভাল করিয়া সর্ব্বদা ধারণা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মানুষের চেহারা যেমন, ভাষার এবারত সেইরূপ। অর্থাৎ সকল মানুষের রক্ত মাংস পেশি অস্থি মজ্জা মেদ, শারীর উপাদান ও শারীর প্রকৃতি মোটের উপরে এক হইলেও, এই সকল উপাদান ও এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক মানুষের মুখে, ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, বিশেষ এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াতে এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে, যাহা অপর সকল মানুষে ফুটে না। শরীর সম্বন্ধে এই বিশেষত্বটুকুই সে ব্যক্তির নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব। সেইরূপ মনেরও

একটা বিশেষত্ব আছে। যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে ছাঁচে ফেলিয়া সে জগতের অশেষবিধ বস্তু ও বিষয়কে আপনার মনের ভিতরে গুছাইয়া রাখে, এবং যে আকারে এ সকল বিষয় সে অন্যের নিকটে প্রকাশ করে, এ সকলের ভিতর দিয়া, তার মনের নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বস্তু ফুটিয়া উঠে। এইটীই তার নিজের 'এবারত' বা style ; এই এবারতটী মানুষের মনের, চিন্তার, ভাব-রাজ্যের, অন্তর্জ্জগতের চেহারা। কার চিন্তার ছাঁচটা কিরূপ, কার মনের শক্তি ও গতি কোন্ দিকে, তার এবারতের ভিতর দিয়া তাহা ধরা পড়ে। বাঙ্গালীর একটা মন আছে—অর্থাৎ সমষ্টিগত এই যে বঙ্গসমাজ, বহু শতাব্দ সহস্রাব্দ ধরিয়া এই ভারতবর্ষে যে সমাজ অপরাপর ভারতীয় সমাজ হইতে একটু পৃথক্ হইয়া, একটা কিছু অল্পবিস্তর বিশেষত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার মনের চেহারায় সেটী গাঁথিয়া আছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে, খাঁটি বাঙ্গলা এবারতে বা style এ বাঙ্গালীর এই মানসিক চেহারাটী ধরা পড়ে। এই চেহারাটী যেখানে নাই, বাঙ্গলা এবারত, অর্থাৎ বাঙ্গালীর খাঁটি সাহিত্যের ছাঁচটাও সেখানে নাই। এ ছাঁচটী আধুনিক বাঙ্গলাসাহিত্যে খুবই যেন উলট্‌পালট্ হইয়া যাইতেছে। বিদ্যা যখন হজম হয় না, তখন সাহিত্যে অজীর্ণ-লক্ষণ সর্ব্বত্রই দেখা গিয়া থাকে। বিদেশের বিদ্যাশিক্ষায় কোনও অপরাধ হয় না। না শিখিলে বরং স্বদেশের প্রাণবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির সাহিত্যও জীর্ণ ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিদ্যা কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব বস্তুও নহে। এই একাদশ ইন্দ্রিয় আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড,—এই লইয়াই তো সকল প্রকারের লৌকিক বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলিও সকল মানুষেরই আছে, আর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও সকলেরই ভোগদখলে রহিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাটাও সকলেরই সম্পত্তি। কিন্তু বিদেশের

বিদ্যা শিখিলেই তো হয় না, হজম করাও চাই। এই হজমটা যারা করিতে পারে না, তাদের হাতেই বিদেশের বিদ্যাপ্রভাবে স্বদেশের অন্তঃপ্রকৃতি ও স্বদেশী সাহিত্যের এবারত, উভয়ই নষ্ট পাইবার উপক্রম হয়। এ বিপদটা আমাদের বড় বেশী। আমাদের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকেরাও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে এ বিপদের হাত এড়াইতে পারেন নাই। বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে, আমাদের মধ্যে, আধুনিক স্বাদেশিক ধর্ম্মসাহিত্যে, এমন কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার, লোকপ্রকৃতির ও সমাজপ্রকৃতির কোনই সঙ্গতি নাই। শব্দ ধার করা যে টাকা ধার করার মতন একটা অতিশয় গুরুতর অন্যায়, এমন কথা বলি না। কিন্তু যখন নিজেদের সাহিত্য ও শাস্ত্রভাণ্ডারে সে অর্থপ্রকাশক শব্দ পাওয়া যায় না, তখনই তো শব্দ ধার করা প্রয়োজন। এ ভাবে ধার করাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে নিজেদের কোনও দৈন্য নাই, সে বিষয়ে পরের পরিভাষা ধার করিয়া আনিলে, নিজের শব্দসম্পত্তির বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ভাবরাজ্যে এবং জ্ঞানরাজ্যে পর্য্যন্ত একটা অলীকতা আসিয়া পড়ে। শব্দ, বস্তুর বা রসের সঙ্কেত বই তো আর কিছুই নয়! যদি বস্তুই আমাদের না থাকে, যে শব্দ যে রসের সঙ্কেত সে রসের আস্বাদনই যদি আমাদের ভাগ্যে কখনও না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দ আনিলেই তো চলিবে না। সে শব্দকে সত্যোপেত ও শক্তিশালী করিতে হইলে, সে বস্তুটীকেও লাভ করিতে হইবে, সে রসেরও সাধনা করা আবশ্যক হইবে। আর এইখানেই যত বিপদ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। এ বিপদে পড়িয়া কোনও দিকে কেবল বাঙ্গলা এবারত ও বাঙ্গলা সাহিত্য নয়, কিন্তু বাঙ্গালীর চরিত্র পর্য্যন্ত ভিত্তিহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষাকে নানা দিকে খুবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, যদিও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতন, কেশবচন্দ্রের সাহিত্যসেবার বড় একটা বেশী উল্লেখ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে কেশবচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষায় এমন দু চারিটা নূতন শব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাহা খাঁটি বাঙ্গলা নয়, যার ভিতরকার বস্তুর বা রসের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বা ইতিহাসের কোনই সম্পর্কও নাই। "বিবেক-বাণী" এই জাতীয় একটা কথা। আমাদের চিন্তাতে ও সাধনায় বিবেক শব্দের প্রতিষ্ঠা বহুকাল হইতেই হইয়াছে। উপনিষদ্ যুগে ইহার প্রথম পরিচয় পাই। কিন্তু সে বস্তু আর কেশবচন্দ্র যাকে বিবেক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ বস্তু, এক নহে। আমাদের বিবেক সাধন-রাজ্যের একটা অতি নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ বস্তু। অনিত্য সংসারকে নিত্য পরমার্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানার নাম আমাদের বিবেক। এ বিবেক অতি দুর্ল্লভ বস্তু। লাখের মধ্যে একেরও এ বস্তু লাভ হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কেশব বাবু "বিবেক" বলিয়া যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, সিদ্ধ অসিদ্ধ সকলেই তার দাবী করে। এ বস্তু ইংরেজের কন্‌সিয়ান্স্ (Conscience); আমাদের বিবেক নয়। ইংরেজ যাকে conscience বলে, আমরা তাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া আসিয়াছি। বিবেক ইহার অনেক উপরকার রাজ্যের কথা। আর কেশব বাবু ইংরেজের conscienceকে আমাদের প্রাচীন সাধনার বিবেকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-চিন্তার ও ধর্ম্মসাধনার যে একেবারেই কোনও অনিষ্ট করেন নাই, এমনই বা বলা যায় কি? রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষাকে

বহুবিধ অভিনব শব্দসম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন সত্য, এ ঋণ বাঙ্গালী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবে। কেশবচন্দ্রের মতন, তিনিও দু একস্থলে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণে এরূপ দু একটী শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর বিশ্বমানব কথাটার উল্লেখ করা যায়। ইংরেজের 'হিউম্যানিটি' রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বমানব"। এই হিউম্যানিটি বস্তু আধুনিক য়ুরোপীয়েরা কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছে, সাধনাবলে লাভ করে নাই। ইহা কৃষ্ণত্ব, শুক্লত্ব প্রভৃতির মতন একটা গুণবাচক শব্দ মাত্র, নিজস্ব বস্তুত্ব বা স্বরূপ ইহার কিছুই নাই। অথচ য়ুরোপীয়েরা হিউম্যানিটি বলিয়া যে তত্ত্বকে হাতড়াইতেছে, তাহা আমাদের সাধনাতে বহুকাল হইতে, নারায়ণ নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই নারায়ণ গুণবাচক শব্দ নহে, বস্তুবাচক শব্দ। নারায়ণ abstraction নহেন, কিন্তু person. আমাদের এমন নারায়ণ থাকিতে য়ুরোপীয় হিউম্যানি-টিকে আমাদের ভাষাতে ও চিন্তাতে "বিশ্ব-মানব"-রূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এইরূপ অকারণে পরের সাধা সুর ভাঁজিতে গিয়া নিজের অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠতর স্বরগ্রামকে ভুলিবার উপায় করিয়া আমরা অলক্ষ্যে ভাষার ও সাহিত্যের কোন অমঙ্গল সাধন করিতেছি কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র এদিক্ দিয়া এবারতের (style) আলোচনা করেন নাই। এই সকল দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তিনি আপনিই আপনার সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ভাষা দেশের লোকের প্রাণসংস্পর্শে প্রাণময়ী হইবে, কথাটা অতি সত্য। কিন্তু প্রাণবস্তু তো আর জড় নহে। নিয়তই যে এই প্রাণ স্ফূরিত হইতেছে; নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিও নিত্য নূতন রস আকর্ষণ করিয়া, দেশের প্রাণ-বস্তু উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ প্রাণ যে সেই

মহাপ্রাণেরই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যেই সেই অনাদি অনন্ত বিশ্ব-প্রাণ, অনাদি অনন্তরূপেই লুকাইয়া আছেন। এই জন্যই এই প্রাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠে। এ বিকাশের বিরামও নাই, শেষও নাই। সুতরাং যতটুকু ফুটিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াই পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। যা এখনও ফোটে নাই—কিন্তু ফুটিবার উপক্রম করিতেছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং কেবল স্থিতির দিক নয়, গতির দিক দেখিয়াও সাহিত্যকে চলিতে হইবে। দশের পুরাভ্যস্ত কথার সাহায্যে, দেশের প্রাণের অন্তঃপুরে সাহিত্যিককে যেমন প্রবেশলাভ করিতে হইবে, সেইরূপ আবার ভিতরের ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তে যে সকল নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটনোন্মুখ হইতেছে, অভিনব শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সে গুলিকেও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখা যে অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অক্ষয়চন্দ্র এ সকলই জানেন ও বুঝেন; তবে তাঁর অভিভাষণে এদিক্‌টা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। লোকে কি জানি তাঁহাকে ভুল বুঝে, এই জন্যই এ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল। অক্ষয়-চন্দ্র যদি নিজে আর একদিন সাহিত্যের এই গতির দিক্‌টা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব।

স্বর্গীয় উইলিয়েম টি, ষ্টেড্

বাল্যকাল হইতে ইংরেজি গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের চরিতাখ্যান পড়িয়াছি। ইংরেজসমাজের মাঝখানে বসিয়াও ছোট বড় অনেক ইংরেজের সঙ্গে নানা কর্ম্মে, নানা ভাবে, মেশামিশি করিয়াছি। কিন্তু উইলিয়েম, টি, ষ্টেডের মত এমন খাঁটি ইংরেজ অতি অল্পই দেখিয়াছি।

"খাঁটি" ও "ভাল"

যে বস্তু ঠিক আপনার স্বরূপেতে থাকে তাহাকেই আমরা খাঁটি বস্তু বলি। কিন্তু খাঁটি হইলেই যে সে বস্তু সকলের চক্ষে ভাল হইবে এমন বলা যায় না। দ্রব্যগুণসম্বন্ধে, বোধ হয়, যা খাঁটি তাই ভাল, আর যা ভাল তাই খাঁটি হয়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় কি? আমরা কোনো দ্রব্যের নিজের প্রকৃতির দ্বারাই তার সত্যিকার ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের বেলা আমরা তার ভিতরকার প্রকৃতির সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সন্ধান করি না; আমাদের নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি রুচি ও অভ্যাসের দ্বারাই তার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকি। সকল মানুষ যদি সমান হইত, তবে এরূপ বিচার অসঙ্গত হইত না। কিন্তু মানুষ যে সকল সমান নয়। সকল জলই যেমন সমান, জলে জলে যে বেশ কম দেখি, তাহা জলের ভিতরকার প্রকৃতিগত নহে, জল ছাড়া অন্য কোনো ধাতুকণা বা লবণাদি তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জলের গুণের তারতম্য উৎপাদন করে; সকল সোণাই যেমন সমান; সকল পারদ গন্ধকই যেমন সমান; সকল মানুষ তো আর সেরূপ সমান নয়। মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা তা' তার প্রকৃতিগত। সে প্রকৃতির বাহিরের কোন বস্তু

তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এ সকল ভেদাভেদের সৃষ্টি করে নাই। আর মানুষে মানুষে এই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে একের যা' ধর্ম্ম অপরের তাই ধর্ম্ম হয় না, একের ভাল মন্দের দ্বারা অপরের ভালমন্দের বিচার সঙ্গত হইতেই পারে না ; সুতরাং কোনো মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকলের বিচারে সে ভালও হইবে, আর সকলে কাহাকেও ভাল বলিলেই যে সে খাঁটি হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বরং এ সংসারে দশজনে যা'কে ভাল বলে অনেক সময় সে খাঁটি হয় না ; নিজের স্বরূপেতে থাকা তার পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে।

ভাল ইংরেজ ও খাঁটি ইংরেজ

এমন ইংরেজ তো দেখিয়াছি যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এমন বিস্তর ইংরেজ সর্ব্বদাই তো দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে নিতান্তই মন্দ ঠেকে। কিন্তু আমরা যাঁহাকে ভাল বলি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ আর আমরা যাঁহাকে মন্দ দেখি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ নহেন, এমন কথা বলা যায় কি? বরং আমরা যে ইংরেজকে বড় ভাল বলি তার পক্ষে খাঁটি ইংরেজ না হওয়ারই সম্ভাবনা কি বেশী নাই? লাট রিপণ্ আমাদের চক্ষে বড় ভাল ইংরেজ ছিলেন। তাঁর মত এমন ভাল লাট বহুদিন ভারত শাসন করিতে আসেন নাই। কিন্তু রিপণচরিত্রে যে বস্তু দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে বস্তু ইংরেজচরিত্রের বিশেষত্ব নহে। রিপণের শান্তমূর্ত্তি, সদাপ্রসন্ন ভাব, সমাহিত চেষ্টা-চরিত্র, ধর্ম্মভয় ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আমরা ইংরেজ আভিজাত্যের পরিচয় পাই নাই, বরং আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শেরই কথঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। আর তারই জন্য রিপ্লণকে আমাদের এতটা ভাল লাগিয়াছিল। রিপণ লোক অতি মহৎ ছিলেন, সন্দেহ নাই ;

কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। রিপণের মত, ভারত-বন্ধু স্যার হেন্‌রি কটনও লোক অতি ভাল। রিপণকে দেখিয়া যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভাব মনে আসিত, কটনকে দেখিয়া, তাঁর কথাবার্ত্তায় ভাবস্বভাবে, কতকটা সেইরূপ আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্বমানবভক্ত, বাঙ্গালী আন্দোলনকারী বা এজিটেটরদের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ফলতঃ কটন যখন আসামের চিফ্‌কমিশনার ছিলেন, তখন শিলঙ্গের সিভিলিয়ান্ সমাজ, পরিহাসচ্ছলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে "বাবু চিফ্" বলিয়াই ডাকিতেন। আর তারই জন্যই বস্তুতঃ কটনকেও আমাদের এত ভাল লাগে। কিন্তু রিপণ, কটন, এঁরা কেউ যে খাঁটি ইংরেজ, এ কথা বলিতে পারি না।

ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব

ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, সে বস্তু যাঁর ভিতরে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যাইতে পারে, অন্যকে নহে। দুধ যখন সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপে থাকে, তখনই কেবল তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়। খাঁটি দুধের চাইতে কারো কারো নিকটে রাবড়ী ঢের বেশি মিষ্টি লাগে। ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থায় ঘোল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশি উপকারী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া রাবড়ী বা ঘোল খাঁটি দুধ হয় না। যেমন দুধের দুগ্ধত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে, যে বস্তুরূপে দুধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়; সেইরূপ ইংরেজেরও ইরেজত্ব বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু আছে, এ বস্তুরূপে থাকিলেই ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ হয়। দুধের দুগ্ধত্ব যেমন দুধকে দুনিয়ার আর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইংরেজের এই ইংরেজত্ব বস্তুও তাহাকে দুনিয়ার আর

সকল জা'ত হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সকল মানুষই এক হিসাবে সমান বটে ; কিন্তু আর এক হিসাবে কোনো মানুষই আর কোনো মানুষের মত নহে। সকল মানুষেরই দেহ-গঠন মোটের উপরে এক ; সকলেরই মোটের উপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে ; সকলেরই মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে মন বিরাজ করিতেছেন, মনের উপরে বুদ্ধি ; বুদ্ধির উপরে আত্মা ;—সভ্য ও অসভ্য, আর্য্য অনার্য্য, মানুষমাত্রেই এ সকল সাধারণ মানবধর্ম্ম রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সকল মানুষ তো সমান নয়। কারণ এই সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্মের মধ্যেই আবার ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে তার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষকে অপর সকল মানুষ হইতে আলাহিদা করিয়া রাখিতেছে। এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুটী তার চেহারায়, তার চাহনিতে, তার গলার স্বরে, তার পায়ের শব্দে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে রূপে সে ভাবে-চিন্তে,—এ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে বিশেষত্বটুকু যাহাতে এক মানুষকে আব এক মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে, ইহাকে সাধারণ মানবধর্ম্মের অন্তর্গত ব্যক্তিধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যসমাজের বা মনুজ-গোষ্ঠির কতকগুলি নিজ ধর্ম্ম আছে। আর এই যে নিজস্ব সমাজধর্ম্ম বা গোষ্ঠি-ধর্ম্ম বা জাতি-ধর্ম্ম, ইহারই জন্য এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। বিশাল মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্বকে, ইহুদীর ইহুদীত্বকে, জর্ম্মাণের জর্ম্মাণত্বকে, ইংরেজের ইংরেজত্বকে,—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন জা'তের জাতিত্ব বা জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানুষের হিসাবে ইহুদী ও হিন্দু, জাপ ও জর্ম্মাণ, রুশ ও চীন,

ইতালীয় ও ইংরেজ, এঁরা সকলেই সমান। সকলেরই মানুষের দেহ, মানুষের মন, মানুষের ভাবস্বভাব রহিয়াছে। অথচ জাতির হিসাবে, ইহাদের সকলেরই অপর সকল হইতে ভিন্ন। হিন্দুর চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, ভাবস্বভাবে, এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা জগতের আর কোনো জা'তের ভিতরে নাই। এই বিশেষত্ব-টুকুই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যে সকল চিহ্ন দ্বারা দুনিয়ার অসংখ্য জা'তের মাঝখানে আমরা হিন্দুকে বাছাই করিয়া আলাহিদা করিতে পারি, তাই তার হিন্দুত্ব। সেইরূপ যে সকল চিহ্নের দ্বারা জর্ম্মাণকে জগতের আর দশটা জা'তের ভিতরে চিনিয়া লইতে পারা যায়, তাহাই তার জর্ম্মাণত্ব। আর যে সকল লক্ষণার দ্বারা ইংরেজকে এইভাবে বিশ্বের মানবসমাজের মাঝখানে চিহ্নিত করিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই তার ইংরেজত্ব। এই ইংরেজত্ব-বস্তু ইংরেজের চেহারায়, তার গঠনে, তার বর্ণে, তার সর্ব্ববিধ সূক্ষ্ম শারীর ধর্ম্মে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, জীবনের সকল বিভাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। যাঁর ভিতরে এই ইংরেজত্ব-বস্তু বেশি লক্ষ্য করিতে পারি, যে ইংরেজ আপনার জা'তের এই সকল স্বরূপলক্ষণেতে অবস্থান করিতেছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যায়। আর এই অর্থেই ষ্টেড্‌কে আমি অত্যন্ত খাঁটি ইংরেজ বলিতেছি।

ইংরেজত্বের শারীর লক্ষণ

আমাদের দেশের নানা জাতের নানা লোকের ভিতরে কে যে হিন্দু আর কে যে অহিন্দু ইহা যেমন তাহার চেহারাতেই অনেক সময় ধরা পড়ে, সেইরূপ বিলাতের নানা জা'তের লোকের মধ্যে কে যে ইংরেজ ইহা তার চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়। বিলাতে ইংরেজ আছে, স্কচ্ বা স্কট্ আছে, আইরিশ আছে, ওয়েল্‌শ্ আছে ; তাহা ছাড়া জর্ম্মাণ,

রুশ, ইতালীয়, ফরাসীস্, এ সকল শ্বেতাঙ্গও বিস্তর আছে। আর কিছুদিন সে দেশে বাস করিলেই কে কোন্ জা'তের লোক ইহা তাহাদের চেহারা দেখিয়াই ঠিক করিতে পারা যায়। যেখানে পুরুষানুক্রমে অসজাতীয় বিবাহ নিবন্ধন নানা জাতের রক্তের বেশি মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে ইংরেজ, কে জর্ম্মাণ, কে আইরিশ, ইহা একেবারে ঠিক করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে এরূপ শোণিত-মিশ্রণ হয় নাই, সেখানে খাঁটি ইংরেজ যে কে ইহা তার চেহারাতেই ধরা পড়ে। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ভারি ভারি ঠেকে। আইরিশের বা ইতালীয়ের চেহারা যেমন কাটা ছাঁটা, ইংরেজের চেহারা সেরূপ নয়। আইরিশ বা ইতালীয়ের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপভাবে আপন আপন উৎকর্ষ-লাভের চেষ্টা করে, ইংরেজের যেন সেরূপ করে না। নাক, চোখ, ভ্রূ, কপোল, ললাট, কর্ণ, গ্রীবা,—আইরিশ বা ইতালীয়ের চেহারায় এরা সকলে আপন আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া, সকলে মিলিয়া, তারই ভিতর দিয়া যেন একটা সুন্দর সঙ্গত্ মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপই মনে হয়, ইংরেজের চেহারাতে এ ভাবটা লক্ষ্য করা যায় না। আইরিশের বা ইতালীয়ের, প্রাচীন গ্রীশীয়ের বা রোমকের চেহারা দেখিলে মনে হয় যে বিধাতাপুরুষ বুঝি আপনার কারখানায় নিবিষ্টমনে বসিয়া ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করিতে করিতে, অপূর্ব্ব বাঁটুলি দিয়া, এ চেহারা-গুলি খুদিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজকে গড়িতে যাইয়া কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজের চেহারার উপকরণগুলি বেশ বাছিয়া গুছিয়াই যে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষটা যেন, কোনো দৈব কারণ-বশতঃ বিধাতাপুরুষ আঙ্গুল দিয়াই সেগুলিকেই - ঠাসিয়া, টিপিয়া, ইংরেজের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, এমনই মনে হয়। তারই জন্য ইংরেজের

গঠনটা কেমন মোটা, ভারি, স্থূল। চীন-জাপের মতন ইংরেজের নাক খাঁদা নয়, আবার আইরিশ বা ইতালীয়ের মত চাঁছাছোলাও নয়, কিন্তু মোটা। ইংরেজের চক্ষু আকর্ণায়তও নহে, অথচ খুব ছোটও নহে; কিন্তু রংএ ও আকারে কতকটা মার্জ্জার চক্ষুরই মত; তার মোহিনীশক্তি অত্যন্ত কম। ইংরেজের কেশ কটা; চিবুক চওড়া; গ্রীবা বঙ্কিমও নয়, খাটও নয়, কিন্তু কতকটা মোটা। তার সমুদয় দেহগঠনই অনেকটা স্থূল। কিন্তু এই স্থূলত্বে কোনো বিশেষ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠে না, কেবল সতেজ রক্তমাংসের একটা জীবন্ত প্রভাবই যেন অনুভূত হইয়া থাকে। এই রক্তমাংসের প্রভাবের একটা বিশেষ শব্দ ইংরেজিতে আছে, আমাদের ভাষায় আছে বলিয়া জানি না। ইংরেজিতে এ বস্তুকে এনি-ম্যালিজ্‌ম্ (Animalism) বলে। আর খাঁটি ইংরেজ যত কেন উন্নত-চরিত্রের হউন না, এই এনিম্যালিজ্‌ম্ বস্তুটী তাঁর চেহারাতে সর্ব্বদাই স্বল্প বিস্তর ফুটিয়া রহে। বুলডগ (Bulldog) নামে যে এক জাতীয় বিলাতী কুকুর আছে, সারমেয়-সমাজে তার চেহারা যে ছাঁচের, কুকুরজাতির ভিতরে সে চেহারার যে বিশেষত্ব আছে, মনুষ্যসমাজে ইংরেজের চেহারাও কতকটা সেই ছাঁচের।

ইংরেজত্বের মানস-লক্ষণ

ইংরেজের চেহারা স্থূল কিন্তু শক্ত, মোটা কিন্তু অনমনীয়, কোন অঙ্গই তার অপরিস্ফুট নাই, অথচ কোন অঙ্গই যেন জড়ত্বের ও ইতরজীবত্বের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। যেমন ইংরেজের চেহারায় বুল ডগ্‌কে মনে করাইয়া দেয়, তেমনি তার প্রকৃতিও অনেকটা এই বুল্‌ডগেরই মত। বুল্‌ডগ্ একবার কোনো শীকারের পশ্চাতে ছুটিলে সে শীকারকে কখনো ছাড়িয়া আসে না। একবার

কোনো শীকারকে ধরিলে, প্রাণ যায় যাক্‌ তবুও তার দাঁতের কবাট আর খোলে না। ইংরেজও সেইরূপ যে লক্ষ্যকে একবার সন্ধান করে, তাহাকে কখনো লাভ না করিয়া ছাড়ে না। যাহা একবার ধরে, প্রাণান্ত হইলেও তাহাকে আর পরিত্যাগ করে না। সহজে সে কোনো বিষয়ে কাণ দেয় না। হুজুগে পড়িয়া সে আত্মহারা হয় না। কোনো বস্তুকে বুঝিতে তার সময় লাগে। কোনো লক্ষ্যকে সন্ধান করিবার পূর্ব্বে সে অনেক ভাবে-চিন্তে। তার বৈশ্যপ্রকৃতি ক্ষতি-লাভের খতিয়ান না করিয়া কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু একবার যদি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে, একবার যদি কোন লক্ষ্যকে সন্ধান করে, একবার যদি কোনো ব্যাপারে হাত দেয়, তবে তার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টায় ইংরেজ আর অগ্রপশ্চাৎ বা ভালমন্দ, বা ক্ষতিলাভ, কোন কিছুরই গণনা করে না। ইংরেজকে দেখিলেই, তার চেহারার ভিতরেই, একটা পশু-ভাবের প্রভাব লক্ষ্য হয়। তার শারীর প্রকৃতিকে অনেকটা তামসিক বলিয়াই মনে হয়, সত্য; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে নিদ্রালস্য প্রভৃতি তমোধর্ম্মের লেশ মাত্র আছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাদার, দোকান-পশারীর জাত, অথচ দোকানীপশারীর স্বভাবসুলভ কৃপণতা তাহাতে নাই। ইংরেজের বুদ্ধি অনেকটা স্থূল সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মতত্ত্ব ধরিবার শক্তি তার কম, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অথচ স্থূলবুদ্ধি লোকের মধ্যে যে এক প্রকারের মানসিক জড়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কথাটা আপাতত স্ববিরোধী হইলেও নিরতিশয় সত্য যে জগতের অপর জাতির মধ্যে সচরাচর যাহা নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই ইংরেজের মধ্যে, ইংরেজ-প্রকৃতির বিশেষত্বনিবন্ধন, তার অশেষ গুণগরিমার মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টেডের শারীর লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি

ইংরেজপ্রকৃতির এই সহজ ও বিশেষ ধর্ম্মগুলি ষ্টেডের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সকল প্রসিদ্ধ ইংরেজের চেহারা দেখিয়াছি, তার কোথাও ইংরেজের ইংরেজত্বটা এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। গ্ল্যাডষ্টোন্ কি মর্লে, টেনিসন্ কি মরিস্, হ্যারিসন্ কি স্পেন্সার, এঁদের সকলের চেহারাতেই এমন কিছু না কিছু চাঁছা-ছোলার, কাটাকুঁদার ভাব ছিল, যে ভাব খাঁটি ইংরেজের চেহারায় নাই। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ঢালাই জিনিষ, খোদাই জিনিষ নহে। এ চেহারা অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল। ষ্টেডের চেহারাও ঢালাই ছিল, খোদাই ছিল না। তাহাও অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল ছিল। ষ্টেড্‌কে দেখিয়া মনে হইত, বিধাতাপুরুষ যে বিশেষ ছাঁচে প্রথমে ইংরেজকে গড়িয়াছিলেন বহুদিন পরে বুঝি সেই ছাঁচটাকে ধুইয়া মুছিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, আবার যেন তাহাতেই আমাদের এ কালে ষ্টেড্‌কে ঢালাই করিয়া পাঠাইয়াছেন। ষ্টেডের মাথাটা বড় ছিল। আর সেই বড় ও সুগোল মস্তকের ঘননিবিড় কেশরাশি তাঁর ভিতরকার ভাবপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করিত। অতিশয় ভাবপ্রবণ লোকে একটু লঘুচিত্ত, একটু চঞ্চল, একটু নিষ্ঠাহীন হইয়াই থাকে। কি আইরিশ্, কি স্পেনীয়, কি ফরাসীস্, কি ইতালীয়,—য়ুরোপের ভাবপ্রবণ লোকেরা সকলেই স্বল্পবিস্তর লঘুচিত্ত ও চঞ্চল ও নিষ্ঠাহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরেজের চরিত্রে এ লঘুচিত্ততা, এ চাঞ্চল্য, এ নিষ্ঠাহীনতা নাই বলিলেই হয়। ষ্টেডের আন্তরিক ভাবপ্রবণতার মধ্যেও এরূপ লঘুচিত্ততা বা চাঞ্চল্য বা নিষ্ঠাহীনতা ছিল না। তাঁর সুগঠিত মস্তকের নিবিড় কেশরাশি যেমন তাঁর ভাবপ্রবণতার পরিচয় দান করিত, তেমনি আবার তাঁর প্রশস্ত ললাট, উন্নত কপোল, অপেক্ষাকৃত স্থূল

অধরোষ্ঠ ও আয়ত চিবুকের ভিতর দিয়া তাঁর চরিত্রের স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢপ্রতিজ্ঞতার আভাই ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁর চোখ দু'টা ছোট ছিল। কিন্তু সেই ছোট গোলকের তীব্র দৃষ্টির ভিতর দিয়া লোকচরিত্র বুঝিবার একটা অসাধারণ শক্তি এবং আপনার স্বত্বস্বার্থ রক্ষা করিবার উপযোগী একটা বণিকস্বভাবসুলভ চতুরতাও প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ষ্টেডের মুখের দিকে চাহিলেই মনে হইত, এ লোককে ক্ষেপান যায়, কিন্তু ঠকান যায় না। এ ব্যক্তি ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া, কোন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বনাশকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিতে পারে, কিন্তু ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আপনি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত না করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় বা কোন হুজুগের টানে, গোলে হরিবোল দিয়া, অন্ধকারে এক পা-ও চালিতে পারে না। ষ্টেডের চেহারার ভিতব দিয়াহ এ সকল যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

ষ্টেডের বাল্যশিক্ষা

ষ্টেড্ অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া অতি সামান্য ভাবেই জীবন যাত্রা আরম্ভ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা আজিকালি উচ্চশিক্ষা বলিয়া জানি, সে শিক্ষালাভের সুযোগ তাহার ঘটে নাই। ষ্টেড্ কোন বড় স্কুলে যান নাই। বিলাতে আমাদের দেশের মত বর্ণভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। বর্ণভেদে সামাজিক পদমর্য্যাদাকে একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের জন্ম ও কুলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রেণী-ভেদে সামাজিক পদ-মর্য্যাদাকে অনেক পরিমাণে ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বর্ণভেদের উপরে যে সমাজ গঠিত, সেখানে ধনের মূল্য কখনই অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতে পারে না। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

অন্যদিকে শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজ গড়িয়া উঠে, সেখানে ধনের মূল্যটা আপনা হইতেই চড়িয়া যায়। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে জীবনের সকল পথেই একটা দুরতিক্রমণীয় ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ণভেদ-প্রতিষ্ঠিত সমাজে, যে বড় কুলে জন্মাইল, তার ধন থাক্ বা না থাক্, আপনার কুলোচিত বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাকে উপার্জ্জন করিতেই হয়। সমাজও সেখানে আত্মরক্ষার জন্য আপনা হইতেই এই বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রেণীভেদপ্রতিষ্ঠিত সমাজে টাকা দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। এই জন্য শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদ্যালাভ ধনীদেরই সাধ্যায়ত্ত, দরিদ্রের পক্ষে সহজ নহে। বিলাতে ইটন্ ((Eton), হ্যারো (Harrow), উইন্‌চেষ্টার (Winchester), রাগ্‌বী (Rugby) প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্কুল আছে। দেশের বড়লোকের বালকেরাই এই সকল স্কুলে যাইতে পারে। আভিজাত্যের দাবী যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। এ সকল স্কুলের বালকেরাই অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলেরই প্রতি উন্মুক্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে বিদ্যালাভ করা এতই ব্যয়সাধ্য যে দেশের সাধারণ গরিব লোকে সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। তার উপরে এই দুইটা বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের অভিমান জাগিয়া আছে যে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সেখানে যাইয়া অনেক সময় "হংসমধ্যে বকো যথা"র ন্যায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ষ্টেড্ গরিব গৃহস্থের সন্তান। বিলাতী সমাজের আভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোন প্রকারের সম্বন্ধের গন্ধ মাত্রও ছিল না। সুতরাং

কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া কোন প্রকারের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অতি অল্প বয়সেই এক আফিসের ছোক্‌রার বা এরেণ্ড বয়ের (Errand-Boy) কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ষ্টেড্‌কে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে হয়।

কালেজের শিক্ষা ও কাজকর্ম্মের শিক্ষা

বিধাতার বিশ্বের যেখানেই কোন বিশেষ মন্দ জাগিয়া উঠে, সেখানে সেই মন্দেরই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধায়ক ভালটাও আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের প্রকৃতি কখনই চিরকাল বা দীর্ঘকাল কোন মন্দকে আশ্রয় করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব, সমাজের পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাহা অপূর্ণ তাহাই মন্দ। আর মানব-প্রকৃতি পূর্ণতার বীজ বুকে ধরিয়া ঋজুকুটিলভাবে সেই পূর্ণতার দিকেই ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তিও ইহাই করিতেছে, সমাজ এই পথেই চলিতেছে। আর তারই জন্য কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার ভিতরেই ভালোর মধ্যেই মন্দ ও মন্দের মধ্যেই ভালো মিশিয়া রহে। এই জন্য রজতপ্রধান বিলাতীসমাজে গরিব লোকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিম্বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যালাভ করা যেমন কঠিন, অন্যদিকে সেইরূপ এ সকল সুযোগ না পাইয়াও যত লোক সেখানে কেবল আপনার অনুশীলন ও অধ্যবসায়-বলে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে অসাধারণ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন সমাজে তাহা সম্ভব হয় না। কি ব্যবসা-বাণিজ্যে কি রাষ্ট্রীয় কার্য্যে কিম্বা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে বিলাতে যাঁহারা সমাজে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহাদের সকলে বা

অনেকেই যে অক্সফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের লোক, এমন নহে। ইংরেজের বিশাল বাণিজ্য যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদের একজনেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজজাতির ক্ষাত্রবীর্য্য যে সকল মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গেই বা অক্সফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের কোন সম্পর্ক ছিল? বারুণীর অঙ্কে বর্দ্ধিত ইংরেজের নৌ-বিলাস হইতেই ইংলণ্ডের বিশ্ববিজয়িনী নৌশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষা হইতে হয় নাই। ফলতঃ সকলে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজে যাইতে পারে না বলিয়াই ইংরেজসমাজের এত লোক বাল্যে কোন শিক্ষা না পাইয়াও শুদ্ধ আপনাদের অদম্য অধ্যবসায়বলে পরজীবনে সমাজের শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। এই অদম্য অধ্যবসায় ইংরেজ-চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।

ষ্টেডের অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব

এই অধ্যবসায় গুণেই ষ্টেড্ও অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া, শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষালাভের কোনো সুযোগ না পাইয়াও, পরজীবনে কেবল আপনার দেশে নহে, কিন্তু সমগ্র সভ্যসমাজে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন যে সামান্য হরকরার কাজে নিযুক্ত হইয়া লণ্ডনের রাজপথে চিঠি হাতে করিয়া ছুটোছুটি করিত, পরে এমন এক দিন আসিল, যখন রুসিয়ার জার (Czar) ও জর্ম্মণীর ক্যায়সার (Kaiser), তুরস্কের সুলতান ও ইংলণ্ডের সম্রাট, নিয়ম-তন্ত্রাধীন রাজমন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রাধীন প্রেসিডেণ্ট, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক, তাঁহারই পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অথচ ষ্টেড্ কখনো সাক্ষাৎভাবে কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করা

তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক নীচুদরের ইংরেজও পার্লেমেণ্টে যাইয়া ক্রমে মন্ত্রীদলে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে ষ্টেড্‌ও তাহা পারিতেন। কিন্তু এ চেষ্টা তিনি কখনো করেন নাই। একবার কেবল তিনদিনেব জন্য পার্লেমেণ্টে যাইবাব তাঁর সাধ হইয়াছিল,—আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তখন আইরিস্ লোক-নায়ক পার্ণেল জীবিত ছিলেন। সে সময়ে কি একটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অহিতাচারেব তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়। ষ্টেড্ পার্ণেলকে তখন একটী আইরিস কনষ্টিটুয়েন্সী (Constituency) জোগাড় করিয়া তিন-চা'র দিনের জন্য তাঁহাকে পার্লেমেণ্টের সভ্য করিয়া দিতে বলেন। পার্লেমেণ্টে দাঁড়াইয়া এই অহিতাচারের প্রতিবাদ করিয়া একটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি তাঁর পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ধার স্থান তাহাকে দিতে রাজি হন। যাহা হউক ষ্টেডেব এই ক্ষণিক সাধও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু পার্লেমেণ্টের সভ্য না হইয়াও ব্রিটিশসাম্রাজ্যনীতির বিকাশসাধনে ষ্টেড্ যতটা সাহায্য করিয়াছেন, গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ততটা সাহায্য করিয়াছেন কি না, সন্দেহের কথা।

আর ষ্টেডের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পশ্চাতে তাঁর সাচ্চা ইংরেজ-প্রকৃতিটীই দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেডের বুদ্ধি যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, তাহা নহে। ইংরেজেব স্বাভাবিকী বুদ্ধি একটু মোটা। তাহা ভারে কাটে কিন্তু ধারে কাটে না। কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্বে বা জটিল বিষয়ে ইংরেজেব বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কোনো জটিল সমস্যার জটিলতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, একটা সম্যক্‌দর্শন ফুটিয়া উঠে। ইংরেজবুদ্ধির এ সম্যক্ দৃষ্টি নাই। যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ব্যবসায়ীর লাভালাভ জানিবার জন্য অত্যাবশ্যক, ততটুকু

দূরদর্শিতা ইংরেজের বুদ্ধিরও আছে। কিন্তু যে সম্যক্‌দৃষ্টি তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ, ইংরেজের সে সম্যক্‌দৃষ্টি নাই। আর সেরূপ সম্যক্‌দৃষ্টি নাই বলিয়াই ইংরেজের একটা অসাধারণ 'গোঁ' আছে। এই গোঁয়ের জোরেই ইংরেজ দুনিয়া জয় করিয়াছে। আর এই গোঁয়ের জোরেই ষ্টেডও অসাধারণ বিদ্যার বল, অথবা বিপুল ধনের বল, কিম্বা উচ্চ আভিজাত্যের বল ব্যতীতও আজীবন ইংরেজসমাজে রাজা ও প্রজা, ইতর ও ভদ্র, সকলের উপরে এতটা আধিপত্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

Maiden Tribute

ষ্টেডের প্রথম প্রতিষ্ঠা "পেল্ মেল গেজেট" (Pall Mall Gazette) নামক পত্রিকায়। সে আজ প্রায় আটাশ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের পাঠকদিগের নিকটে ষ্টেড্ তার পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে দিন "Maiden Tribute of Modern Babylon" নামক প্রবন্ধাবলী পেল্ মেল্ গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল, সে দিন সমগ্র সভ্যজগতের চক্ষু ষ্টেডের উপবে যাইয়া পড়িল। সেদিন ইংরেজ বুঝিল যে বহুদিন পরে একজন মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মিয়াছে। সে দিন দুনিয়া দেখিল যে ইংরেজের বিপুল ধনরাশি, তাহার প্রচণ্ড ভোগবিলাস, তাহার সখ ও সৌখিনতা এ সকলের পশ্চাতেও একটা সাচ্চা মনুষ্যত্ব বস্তু জাগিয়া আছে। সে দিন ইংরেজ সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র যুরোপীয় সমাজেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লণ্ডন সহরে সে সময়ে একদল বড়লোক গরিব পিতামাতাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া তাহাদের উদ্ভিন্নযৌবনা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা-গণের সর্ব্বনাশ করিতেছিল। এই পাপে ইংরেজ আভিজাতসমাজ

নীরয়গামী হইতেছিল। প্রাচীন বেবিলনে, আমাদের দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধনের ন্যায়, ধর্ম্মের নামে, অক্ষতযোনী কুমারীগণের সতীত্ব নাশ করা হইত, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। এই কিম্বদন্তী স্মরণ করিয়াই ষ্টেড্ লণ্ডন সহরকে মডার্ণ বেবিলন (Modern Babylon) নামে অভিহিত করেন। আর বেবিলনের পুরাতন গর্হিতাচার মনে করিয়াই কুমারী বলি বা Maiden Tribute বলিয়া লণ্ডনের ধনীলোক-দিগের এই আধুনিক পশুবৃত্তির ব্যাখ্যান করেন। বিলাতের অতিবড় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই পাপে লিপ্ত ছিলেন। মাতৃরূপিণী রমণীর শ্রেষ্ঠতম বস্তু যে এরূপভাবে বেচা কেনা হয়, ষ্টেড্ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এ দুরাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কেবল লোকের মুখের কথার উপরে নিভর করিয়া সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে অত বড় অভিযোগ আনা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তিনি স্বয়ং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। আপনি একজন লম্পট সাজিয়া, যাহারা এই গর্হিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তেমন লোকের দ্বারা একটা উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার মাতাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, তার কন্যাকে সংগ্রহ কবিলেন। বিলাতী আইনে সে সময়ে ষোড়শ বর্ষই বালিকাগণের নিম্নতম “সম্মতির” বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই বালিকার বয়স যে ষোড়শ বষের ন্যূন ইহা সত্য সত্য ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। যখন এতটা প্রমাণ স্বয়ং সংগ্রহ করিলেন, ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে যখন আর তিলপরিমাণ সন্দেহের অবসর রহিল না, তখন ইহার কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পত্রস্থ করিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবা মাত্র, চারিদিকে তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। ধনীদল আপনাদের কলঙ্ক রটনায়, ক্রোধে,

ভয়ে, লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ জনসাধারণে দারিদ্র্যের অবমাননার কথা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। সভ্য-জগতের লোকে ইংরেজের নামে ধিক্কার দিতে লাগিল। Maiden Tribute লেখার জন্য ষ্টেড্‌কে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা অসম্ভব দেখিয়া, তাঁর শত্রুগণ ষ্টেড্ আপনি যে একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইয়া, আপনার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই, ষ্টেড্ অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে নালিশ রজু করাইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সহবাসের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ষ্টেড্ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাঁর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু এ জন্য ষ্টেডের দুঃখ হইল না। এ দণ্ড তাঁর নিন্দার হেতু না হইয়া শ্লাঘার কারণই হইল। কারাবাস তাঁর অপমানের বিষয় না হইয়া অশেষ গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিল। আমরণ পর্য্যন্ত ষ্টেড্ যে তারিখে তাঁর কারাদণ্ড হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই দিন সেই পুরাতন কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া, সেই ত্যাগযজ্ঞের সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেন। ষ্টেডের জেল হইল বটে, কিন্তু যে গোপনীয় অত্যাচারের কথা লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া তিনি এ দণ্ডভোগ করেন, সে অহিতাচারেরও প্রতিবিধান হইল। Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিলাতের প্রাচীন দণ্ডবিধিতে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা যুবতীগণের সহবাসকে দণ্ডনীয় করিয়া, নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইল। এই বিধান অনুসারে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের "সম্মতির" বয়স অষ্টাদশবর্ষ নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট (Criminal Amendment Act) ইংরেজের সমাজ-জীবনের ইতিহাসে, ষ্টেডের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া চিরদিন ঘোষিত হইবে

বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদনে ষ্টেডের বিশেষত্ব

সাময়িক পত্রের লেখক ও সম্পাদক বলিয়াই ষ্টেড্ আধুনিক সভ্য-জগতে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে সাময়িক সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রভাব যত, এই সকল পত্রের লেখকদিগের প্রতিষ্ঠা তার শতাংশের এক অংশও হয় না। ফলতঃ এ সকল পত্রে কে লেখে বা না লেখে, সাধারণ লোকে তার খবরাখবর রাখে না। বিলাতী সাময়িক পত্র সকল দল বিশেষের মুখপত্র হইয়াই থাকে। যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। লেখকেরা পয়সা খাইয়া লেখেন। যাঁহাদের বেতনভোগী হইয়া ইহাঁরা প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাঁহাদের মতামতই ইহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। নিজেদের বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী কোনো কিছু লিখিবার অধিকার ইহাঁদের প্রায়ই থাকে না। কখনো কখনো নিজেদের যাহা মত নয়, এমন বিষয়ও ইহাদিগকে লিখিতে হয়। এরূপ ব্যবসাদারী সাহিত্যচর্চ্চায় ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইলেও মনোবৃত্তির স্ফূরণ কিম্বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। বিলাতের ধনিলোকেরা এবং রাজ-নৈতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বহুকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের মনুষ্যত্বকে এইরূপভাবে চাপিয়া রাখিয়া ও পিষিয়া মারিতেছিলেন। ষ্টেড্ই সর্ব্বপ্রথমে এই নিষ্ঠুর দাসত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকের ও সাময়িক পত্রের লেখকগণের আত্মসম্মানবোধকে জাগাইয়া তোলেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বেনামী লেখাই বিলাতী সংবাদপত্রের সাধারণ রীতি ছিল। ষ্টেড্ই সর্ব্বপ্রথমে নিজের নাম দিয়া সংবাদপত্রে লিখিতে

আরম্ভ করেন। আজিকালি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের লেখকগণ নিজের নাম দিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ কবিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেনামী লেখাতে সংবাদপত্রবিশেষেরই প্রতিষ্ঠা হইত, দলবিশেষেরই প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইত; জনগণের চিন্তা ও চরিত্রের কিম্বা রাষ্ট্রের কর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে লোকমত সংগ্রহকারী সাময়িকপত্রের লেখকগণের ব্যক্তিত্বের ও বিত্থাবুদ্ধির কোনো প্রকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত না। ষ্টেড্ এ সকলকে বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রের লেখকগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করেন, প্রতিভাশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদগৌরব ও শক্তিসাধ্য যে কোনো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে অনেক বেশী; লোকে পূর্ব্বে ইহা কখনো অনুভব করে নাই। ষ্টেড্‌কে দেখিয়া তারা এখন ইহা বুঝিয়াছে। ষ্টেড্ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন! কিন্তু কি স্বরাষ্ট্রের কিম্বা পররাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ নীতি নির্দ্ধারণে তিনি যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, অনেক রাষ্ট্রমন্ত্রী তাহা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের নৌ-নীতি আজ যে রীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে ষ্টেডেরই উদ্ভাবিত। জর্ম্মণী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রশক্তির নৌবলের তুলনায় ইংরেজের নৌশক্তিকে কি পরিমাণে বাড়াইতে হইবে, তাহার মূলমন্ত্রটী ষ্টেডের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। ষ্টেড্ই প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অপরে যখন এক খানা যুদ্ধজাহাজ নিম্মাণ করিবে, ইংলণ্ডকে তখন দু'খানা নিম্মাণ কারতে হইবে। আজ উদার-নৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের রাষ্ট্রনৈতিকেরা এক বাক্যে এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। আজিকালি য়ুরোপের সর্ব্বত্র শালিশীর দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে, ষ্টেড্ তাহারও সূত্রপাত

করেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হেগ্ (Hague) নগরীতে সভ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেব প্রতিনিধিগণ মিলিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইয়া পরস্পরের বিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিতে পারে, তাহার বিচার আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টেড্ সেই শান্তিসমিতি বা 'Peace Conference' এরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যতীত এই অনুষ্ঠান যে কখনই সম্ভব হইত না, ইহা সকলেই এখন এক-বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ষ্টেডের ধনবল ছিল না। ষ্টেড্ কোনো রাষ্ট্রনৈতিকদলের নেতা ছিলেন না। তাঁর লোকবলও ছিল না। তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি কিম্বা অলোকসামান্য প্রতিভাও ছিল না। তাঁর ছিল কেবল অদমনীয় অধ্যবসায়, অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ, অসাধারণ আত্মনির্ভর এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম ও লোকহিতৈষা। ষ্টেড্ বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমলহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। আর তাঁহার মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই, সামান্য সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়াও তিনি সাময়িক ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র-পরিচালকগণ দুই পথ ধরিয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। এক পথে যাইয়া, সর্ব্বদা লোকমতের অনুসরণ করিয়া, জনসাধারণে যখন যে ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে সেই ভাবেতে ইন্ধন জোগাইয়া তাঁহারা সহজেই লোকের অনুরাগভাজন হইতে পারেন। আর এক পথে যাইয়া, জনসাধারণের কি ভাল লাগিবে সে দিকে দৃক্পাত না করিয়া, কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তারই অনুধ্যান করিয়া, তাহা-দিগকে প্রেয়ের পথে নয়, কিন্তু শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রথম পথের পথিক লোকমতের অনুসরণ করিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় জনসাধারণের সেবা করেন। এ পথ সহজ। এই

পথে অনায়াসে বা অতি স্বল্পায়াসেই সংবাদপত্র-পরিচালক আপনার পশার বৃদ্ধি করিতে পারেন। এ পথ ব্যবসাদারের পথ। বিলাতের প্রতিপত্তি-শালী সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের প্রায় সকলগুলিই এই পথের পথিক। লোকমতের হাওয়া যখন যে বিষয়ে যে দিকে প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা সেই দিকেই আপনাদের লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। দেশের প্রবল রাষ্ট্রীয়-দলের প্রত্যেকেরই দু' এক খানা মুখপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্র নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের মুখা-পেক্ষী হইয়া চলে। এক সময়ে বিলাতে রক্ষণশাল ও উদারনৈতিক, লিবারেল ও কন্সারভেটিভ (Liberal ও Conservative) এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোনোটারই একান্ত অনুগত নয়, এমন সংবাদপত্র ছিল না। তখন যারা সংবাদপত্র কিনিতেন ও পড়িতেন, তাঁরা সকলেই হয় কন্সারভেটিভ না হয় লিবারেল্ এই দুই দলের একদল ভুক্ত হইতেন। আর এই দুই দলের মধ্যে এতটা রেশারেশি ছিল যে একদলের লোকে অপব দলের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। সাময়িক পত্রের পাঠক সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। ক্রমেই এ সকল অবস্থার ঘোর-তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সাময়িক পত্রের পাঠকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক গুণে বেশী হইয়াছে। আগেকার দলাদলির ভাবটাও ক্রমে কমিয়াছে। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয়দলভুক্ত নহে, সাময়িক পত্রের এরূপ অনেক পাঠক এখন জুটিয়াছে। এ সকল লোকই পার্লেমেণ্টে সভ্য-নির্ব্বাচন সময়ে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের ভাগ্যবিধাতা হইয়া থাকে। যখন যে দলের দিকে ইহারা ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন সেই দলেরই জিত হয়। আর আজিকালি বিলাতে এই সকল লোকই ব্যবসাদারী সাময়িক পত্র সকলের প্রভু হইয়া বসিয়াছে। সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন বাজারের মতি গতি লক্ষ্য করিয়া আপনার পণ্য সংগ্রহ করে ও দোকানপাট সাজায়,

গ্রাহকের মন জোগাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা ছাড়া আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যেমন তার থাকে না, সেইরূপ এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালক ও লোকমত কোন্ দিকে চলিতেছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং সেই মতের পোষকতা করিয়াই আপনাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য, ভালমন্দ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তাঁহাদের কর্ত্তব্যসীমার বাহিরে পড়িয়া রহে। এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালক জনমণ্ডলীর আসন্ন পরিচারক রূপে তাহাদের মর্জ্জি জোগাইয়াই দু' পয়সা উপার্জ্জন করেন; লোকের ইষ্টানিষ্ট ও দেশের ভালমন্দের প্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। বিলাতের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই এখন এই পথ ধরিয়া চলিতেছে। ডে'লি মে'ল (Daily Mail) জাতীয় সংবাদ পত্র এই পথ ধরিয়া চলিয়াই দেশটা লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পরিচালনার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নহে। ভালমন্দ বিচার না কবিয়া লোকমতের অনুসরণ করাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায় বা কর্ত্তব্য নহে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক জনমণ্ডলীর পরিচারক হইবেন না, কিন্তু পরিচালকই হইবেন; অনুগত ভৃত্য হইবেন না, কিন্তু তাহাদেন শক্তিশালী গুরু হইয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইবেন। ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সত্য লক্ষ্য। আর আধুনিক বিলাতী সমাজে যে অত্যল্পসংখ্যক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ষ্টেড্ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। যে কালে ষ্টেড্ এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করেন, সে কালে বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদক ও লেখকবর্গের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। যে পেল্ মেল্ গেজেটকে আশ্রয় করিয়া ষ্টেড্ বিলাতের সাময়িক সাহিত্যে

অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই পেল্.মেল্ গেজেটের সঙ্গেও বেশী দিন একসঙ্গে কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ষ্টেড্ "পেল্ মেল্" পরিত্যাগ করিলেন। যে আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে পেল্ মেল্ ছাড়িয়া দিতে হয়, অন্য কোনো সংবাদপত্রের বেতন-ভোগী সম্পাদক বা লেখকরূপে সেই আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। আপনার জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্য ষ্টেড্কে তখন আপনার সত্বাধীনে একখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হয়। এইরূপেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত রিভিউ অব্ রিভিউজের (Review of Reviews) উৎপত্তি হয়। আপনি এই পত্রের সত্বাধিকারী ও আপনি ইহার সম্পাদক ও পরিচালক হইয়া ষ্টেড্ বিগত বাইশ বৎসর কাল আধুনিক সভ্যসমাজে আপনার পবিত্র লোকশিক্ষাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"রিভিউ অব্-রিভিউজ্"

যে অকপটে যে আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, বিধাতাপুরুষ স্বয়ং তাহাকে সেই আদর্শ লাভের উপযোগী বিচারবুদ্ধি ও শক্তি সাধ্য দান করিয়া থাকেন। ষ্টেডের যে অসাধারণ বুদ্ধি কিম্বা অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল, এমন বলা যায় না। কতটা পরিমাণে যে রিভিউ অব রিভিউজ্ (Review of Reviews) তাঁহার লোকশিক্ষাব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিবে, প্রথম হইতেই যে তিনি এটা বুঝিয়াছিলেন এমনও বোধ হয় না। আজি কালিকার দিনে লোকে নিজ নিজ বিষয়-কর্ম্ম লইয়া এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে বড় বড় মাসিক পত্রে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িবার সময় ও শক্তি তাহাদের থাকে না বলিলেই হয়। অথচ দুনিয়ার চিন্তাস্রোত

কোন্ ভাবে কোন্ দিকে চলিতেছে এই সকল মাসিকপত্র না পড়িলে তাহার সন্ধান রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত জনগণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই রিভিউ অব রিভিউজের জন্ম হয়। ইহা অপেক্ষা কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যে ষ্টেড তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। আর প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়াই তাঁহার এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আমরা এখন বিধাতাপুরুষেরই হস্ত দেখিতেছি। ষ্টেড নিজের একখানা দৈনিক সংবাদপত্র না হউক, অন্ততঃ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কেন যে তিনি সে পথে যান নাই জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে তিনি রিভিউ অব রিভিউজের সাহায্যে সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে যতটা প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকার সাহায্যে তাহা কদাপি লাভ কবিতে পারিতেন না। রিভিউ অব্ রিভিউজ ইংরেজীতেই লেখা হয় সত্য, আর লণ্ডনেতেই ছাপা হইত। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইহাকে কখনই কেবল ইংরেজের কাগজ বলা যাইতে পারিত না। য়ুরোপের সর্ব্বত্র যে সকল কর্ম্মী ও মনীষিগণের হস্তে আধুনিক জগতের ভাগ্যসূত্র রহিয়াছে, রিভিউ অব রিভিউজ তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু ছিল। রাজপ্রাসাদে রাজা, মন্ত্রভবনে রাজ-মন্ত্রিগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সেনাশিবিরে সেনানায়ক, সংবাদপত্রের আপিসে সম্পাদক, ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজক, নাট্যশালায় নটনায়ক, আধুনিক সভ্যজগতের সর্ব্বত্র যাহারা জনগণের চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই রিভিউ অব রিভি-উজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহাঁরা সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে, শ্রদ্ধাসহকারে রিভিউ অব রিভিউজ পাঠ করিতেন। বিলাতের অন্যতম প্রধান

রাষ্ট্রনায়ক ব্যালফোর (Balfour) একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনও সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তিনিও রিভিউ অব রিভিউজের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। রিভিউ অব রিভিউজ কেবল যে অপর পত্র হইতে প্রবন্ধ-সার সংগ্রহ করিয়াই আপনার কলেবর পূর্ণ করিত তাহাও নহে। প্রতি মাসে সভ্যজগতের যেখানেই যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটুক না কেন, ষ্টেড্ তাহারই উপরে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একদিকে জগতের দৈনন্দিন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, অন্যদিকে দুনিয়ার লোকমত গঠনের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। রিভিউ অব রিভিউজের চরিত্র-চিত্রগুলি আধুনিক সভ্য জগতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের প্রাণ বস্তুকে ভবিষ্যতের জন্য মূর্ত্তিমন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ষ্টেডের বিচার প্রণালী

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক সভ্য জগতের কোনো দেশে এমন কোনো শক্তিশালী লোকনায়কের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেডের স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ আলাপপরিচয় ছিল না। তিনি কেবল যে জগতের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিই জানিতেন তাহা নহে, কিন্তু এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে ব্যক্তিগত চরিত্র লুকাইয়া থাকে, নখ-দর্পণের ন্যায় সর্ব্বদা তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং ষ্টেড্ কখনই কেবল বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের দ্বারা কোনো বিষয়ের ভালমন্দের বিচার করিতেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যাকার্য্যের ভিতরে যে মানুষের প্রাণ, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের শক্তি ও সংযম, মানুষের লক্ষ্য ও অভীষ্ট জড়াইয়া থাকে, তাহারই দ্বারা এ সকলের বিচার করিতেন। আর এই জন্য প্রত্যেক দেশের কর্ম্মিগণ একদিকে

যেমন তাঁহার মন্তব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা শুনিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ কেবল বাহির হইতে যাহারা সকল বিষয়ের বিচার আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের বুদ্ধির স্থিরতা ও তাহার মতামতের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই বলিয়া প্রায়ই তাঁহার মন্তব্যকে উপেক্ষা করিতেও চেষ্টা করিতেন। যে মানুষ নিজের নিকটে সর্ব্বদা খাঁটা হইতে চাহে, লোকচক্ষে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা প্রমাণিত করা অসম্ভব। মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সত্যের সকল দিকটা সর্ব্বদা একই সঙ্গে তাহার চক্ষুগোচর হয় না। আমাদের সকল সিদ্ধান্তেই অন্ধের-হস্তিদর্শন-ন্যায়টা প্রায় সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইতে পারে। এবং তারই জন্য জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্ব্বপ্রকারের সিদ্ধান্তই উত্তরোত্তর পূর্ণতর হইতে যাইয়াই পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে যাহাকে সচরাচর স্থিরমতি বলে তাহা অনেক সময়েই কেবল রুদ্ধগতির লক্ষণ। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই রুদ্ধগতিকেই arrested development বলে। কিন্তু ষ্টেডের মনের গতি আমরণ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। বয়স তাঁহার বাড়িয়াছিল, কিন্তু শৈশবের সারল্য, যৌবনের উদ্যম, জ্ঞানের পিপাসা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মের চেষ্টা, এ সকলের কিছুই বিন্দু পরিমাণ কমে নাই। জগতের অনেক লোক প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ ও নূতন চেষ্টার প্রকাশ, নিত্য নূতন., জ্ঞান বা নিত্য নূতন রস আস্বাদন, নিত্য নূতন কর্ম্মের আয়োজন, এ সকলই তো প্রকৃত জীবনের লক্ষণ। কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোক ;জীবিত থাকিয়াও জীবনের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে না। আর এই সকল লোকের বিষয়েই সচরাচর আমরা জীবন্ত-মৃত্যুর স্থবিরতার মধ্যে,

তাহাদের রুদ্ধবুদ্ধির স্থিরতাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ষ্টেড্ প্রকৃত অর্থে জীবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি যে প্রাকৃতজনসুলভ স্থিরত্ব লাভ করে নাই ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার মতামতের মধ্যে যে সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হইত তাহা কেবল বাহিরেরই কথা, ভিতরের কথা নহে।

ষ্টেড্ ও রুশ সম্রাট্

ষ্টেড্ আজীবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন যেখানে প্রজা-মণ্ডলী আপনাদের স্বত্বস্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, ষ্টেড্ তখনই তাঁহাদেব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বুয়র যুদ্ধের সময় নিজেদেব গভর্ণমেণ্টেব সমর্থন না করিয়া বুয়র-নেতৃবর্গেব পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলেন। আব এই কারণে সেই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় সাধারণ ইংরেজমণ্ডলীব বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। অথচ যে সিসিল রোড্‌স্ (Cecil Rhodes) প্রকৃত পক্ষে চক্রান্ত করিয়া ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টকে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেন, ষ্টেড্ সর্ব্বদাই সেই সিসিল বোডসের স্তুতিবাদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। সাধাবণ লোকে ষ্টেডের এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোনো প্রকারেব সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা কবিতে পারে নাই। ষ্টেড্ একদিকে যেমন জগতেব সর্ব্বত্র প্রজামণ্ডলীব স্বত্ব-স্বাধীনতা সম্প্রসারণের ও প্রজাতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ য়ুরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্রের একমাত্র অধিনায়ক, রুশিয়ার জারেরও (Czar) পক্ষ সমর্থন করিতেন। লোকে এ অসঙ্গতিব অর্থও বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের সাধুতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছে। কেবল বাহির হইতে ষ্টেডের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিলে এ অসঙ্গতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় না। সিসিল রোড্‌সকে এবং "জাবকে"

সাধারণ লোকে দূর হইতে এবং বাহির হইতেই সর্ব্বদা দেখিয়াছে। তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের প্রাণের অন্তঃপুরে কখনো প্রবেশাধিকার পায় নাই। ষ্টেড্ এই দুই জনকেই অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ধুর নিকট বন্ধু যেমন প্রাণের সকল পর্দ্দা খুলিয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ায়, রোডস্ এবং "জার" দু'জনেই সেইরূপ একদিন ষ্টেডের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ষ্টেডেব প্রকৃতিগত অকপটতার সংস্পর্শে জারের জারত্বের বহিরাবরণ আপনা হইতেই সরিয়া গিয়াছিল। ষ্টেডের অনাবৃত মনুষ্যত্বের সম্মুখে "জার" জাররূপে নহে, কিন্তু শুদ্ধ মানুষরূপে একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। "জারের" ভিতরে যে মনুষ্যত্ববস্তু আছে, তাহারই দ্বারা ষ্টেড্ সব্বদা জারের বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতেন। এই জন্য রুশীয় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার-অবিচারে জারের প্রতি ষ্টেডের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে নাই। রুশীয় গভর্ণমেণ্ট কেবল জারকে লইয়া নহে। সে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য জার কতটা দায়ী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো দায়িত্ব আছে কি না এ কথা বলা কঠিন। রুশের বিশাল ও জটিল শাসনযন্ত্রে জার একটা সামান্য অঙ্গ মাত্র। রুশিয়ার রাজশক্তি ও প্রজা-প্রকৃতির অনাদিকৃত কর্ম্মবশে রুশের স্বেচ্ছাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কেবল রাজার ইচ্ছায় বা আভিজাতবর্গের চেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে নাই। এখন সে স্বেচ্ছাতন্ত্র কেবল রুশরাজের উদার অভি-প্রায়ের বলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা ও প্রজা উভয়ের কর্ম্মক্ষয় না হইলে, কখনই রাজ্যেব এ সংস্কার সাধিত হইবার নহে। গুপ্তহত্যায় কর্ম্মবোঝা বাড়িয়াই যায়, ক্ষয় হয় না। এ পথ স্বাধীনতার পথ নহে। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ যে দিন আপনার কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিবে, তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত তমঃ নষ্ট হইয়া যে

দিন তাহাদের আত্মচৈতন্যের উদয় হইবে, সে দিন গুপ্তহত্যারও প্রয়োজন থাকিবে না, বিদ্রোহেরও প্রয়োজন অনাবশ্যক হইবে; কিন্তু আপনা হইতেই রাজাপ্রজার পরস্পরের অধিকারের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই মীমাংসার পথে রুশের বর্ত্তমান জার প্রকৃতপক্ষে কোনই অন্তরায় নহেন। ইহার প্রধান অন্তবায় বিপ্লবপন্থিগণ। বিপ্লবপন্থিগণ যতদিন গুপ্তহত্যা প্রভৃতি অহিতাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত জারের পক্ষে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার নিবারণ করাও অসম্ভব। সাধারণ লোকে ইহা বোঝে না। সাধারণ লোকে জারের মনুষ্যত্ব যে কতটা ইহা জানে না। আর তারই জন্য তাহাবা সরাসরিভাবে বিচার করিয়া রুশগভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য অন্যায়রূপে জারকে দায়ী করিয়া থাকে। ষ্টেড্ জারকে চিনিতেন। জাবেব রাজৈশ্বর্য্য নয় কিন্তু নিরাভরণ মানুষী মূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রুশশাসনযন্ত্রের জটিলতাও তাঁর চক্ষুগোচর হইয়াছিল। এই যন্ত্রচালনায় জারের শক্তিসাধ্য যে কি এবং অধিকার ও অবসরই বা কতটুকু ইহাও তিনি জানিতেন। আর এ সকল জানিতেন বলিয়াই রুশের রাষ্ট্রীয়শক্তির ও বিপ্লবশক্তিব মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে সকল অমানুষী কাণ্ড ঘটিত, সে সকলের জন্য জারকে তিনি কখনো দায়ী মনে করিতেন না। রুশেব রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে জার যেমন অবস্থাব দাস এবং ঘটনাচক্রের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া আছেন, সিসিল রোডস্ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেইরূপই অবস্থার দাস ও ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। আর এই জন্যই ষ্টেড্ বুয়রব্রিটিশসংগ্রামঘটিত কার্য্যাকার্য্যের জন্য সিসিল রোডস্কেও কখনো সাক্ষাৎভাবে দায়ী করেন নাই।

ষ্টেডের চরিত্রের জটিলতা সকলে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তাঁর

চরিত্রের স্বচ্ছতায় ও তাঁর অকৃত্রিম সত্যানুরাগে, তাঁহার সরল স্বদেশ-বাৎসল্যে ও গভীর মানব-প্রেমে সকলেই মুগ্ধ ছিল। এক প্রকারের সত্যানুরাগ ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানে দোকানদারীর ভিতর দিয়াই একপ্রকারের সত্যবাদিতা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সত্যবাদিতা ব্যতীত সে ক্ষেত্রে কেহ আপনার ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারে না। এই জাতীয় সততাকে লক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ প্রবাদ-বচনে সততাকে শ্রেষ্ঠতম নীতি—অনেষ্টিকে বেষ্ট পলিসি (Honesty is the best policy)—বলিয়াছে। ষ্টেডের সত্যপরায়ণতা এই শ্রেণীর ছিল না। তাহা অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্য তিনি যখন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিতে যাইয়া, অনেক সময় আপনার বিস্তর ক্ষতিও করিয়াছেন। ব্রিটিশ—বুয়রের যুদ্ধের সময়, তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই অকপট সত্যানুরাগের জন্যই, ইদানীং তাঁর নিজের সমাজে এবং কিয়ৎ পরিমাণে, অন্যান্য দেশেও ষ্টেডের প্রতিপত্তি কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোকের পর হইতে ষ্টেড পরলোকতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজিতে যাহাকে স্পিরিটুয়্যা-লিজ্‌ম (Spiritualism) বলে, তার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মৃতলোকের আত্মা যে জীবিতদিগের সঙ্গে উপযুক্ত "মিডিয়াম" পাইলে, কথাবার্ত্তা কহেন ও এমন কি কখনো কখনো ভৌতিকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের চক্ষুগোচরও হন, ষ্টেড্ কিছুদিন হইতে ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এই স্পিরিটুয়্যালিজ্‌মের অনুশীলন করিবার জন্য তিনি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী উইম্বেলডেন্ নামক স্থানে একটা বাড়ী করিয়া, মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দৈনন্দিন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি কিছুকাল এই

বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে কখনো কখনো তিনি জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যার সম্বন্ধেও পরলোকগত মনীষিগণের মতামত জানিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে পরলোকতত্ত্বের অনুশীলনের সত্যাসত্য বা ভালমন্দ বিচারের এ সময় নহে, এ স্থানও নহে। সকলে বা অনেকে যে এ যুগে এ সকল ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, এমনটীও আশা করা যায় না। বরং অধিকাংশ লোকেই এসকল প্রয়াসকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। সুতরাং বিলাতের বা য়ুরোপের তর্কবাদিদিগের সমক্ষে এ সকল তত্ত্বের আলোচনা বড় কম সাহসের পরিচয় দেয় না। ষ্টেড্ অকুতোভয়ে তাঁর সিয়ান্সে (Seanceএ) যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহা বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক লোকেই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি জানিতেন। এজন্য তাঁর ব্যবসায়েরও বিস্তর ক্ষতি হইতেছিল, ইহাও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, লোকের মুখ চাহিয়া তিনি কখনো তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই তাঁর চরিত্রের জোর কতটা ছিল, ইহা সহজেই বোঝা যায়। এ বিষয়েও ষ্টেড্ ইংরেজের সেরা ছিলেন।

যেমন তাঁর সত্যানুরাগ, তেমনি তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও মানবহিতৈষাতেও ষ্টেড্ ইংরেজ-চরিত্রের উচ্চতম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁর দেশকে যেমন ভালবাসেন, জগতের আর কোনো জাতির লোক বোধ হয় তাদের নিজেদের দেশকে তেমন ভালবাসে না। ইংরেজের প্রেম কাজে ফোটে, কেবল ভাবে বা কথায় উচ্ছ্বসিত হয় না। ষ্টেড্ স্বজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দুনিয়ায় যে ইংরেজের মত আর কোনো জা'ত যে ছিল বা আছে ভিতরে ভিতরে তিনি যে তাহা বড় বিশ্বাস করিতেন, এমনো মনে হয় না। তাঁর চক্ষে ইংরেজ আদর্শ মানুষ। কিন্তু সে

ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উন্নত আদর্শভ্রষ্ট যে সকল লোক জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ইংরেজ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, ষ্টেডের চক্ষে সে ইংরেজ আদর্শমানুষ ছিল না। এইজন্য ইংরেজের মধ্যে যা কিছু ভাল, তাহাই তিনি রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, মন্দকে কখনো আদর করিয়া পুষিয়া রাখিতে চান নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল ইংরেজ ইংরেজত্বভ্রষ্ট হইয়া যায়, যারা ইংরেজের সত্যবাদিতা, ইংরেজের ন্যায়পরতা, ইংরেজের উদারতা, ইংরেজের মানবহিতৈষা ভুলিয়া যাইয়া, একটা অযথা ও আত্মঘাতী অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, অপর জাতির লোকের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব ও অমানুষী অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের ইংরেজত্বের অভিমানের সঙ্গে ষ্টেডের বিন্দু পরিমাণেও সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে ষ্টেডের মানবহিতৈষাও, বলিতে গেলে, তাঁর গভীর স্বজাতি বাৎসল্যেরই রূপান্তর মাত্র ছিল। তিনি আপনার জাতিকে ও আপনার সভ্যতা ও সাধনাকে এতটা ভাল বাসিতেন যে একদিকে যেমন সেইজন্য, নিজের জাতের আদর্শ ও চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিবার ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে, এই আদর্শ ও এই সভ্যতা ও সাধনা যাহাতে জগতের সকল লোকে আয়ত্ত ও অধিকার করিতে পারে, তার জন্যও সর্ব্বদাই লালায়িত ছিলেন। দুনিয়ার লোক ইংরেজের মত স্বাধীন ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হউক, ইরেজ রাষ্ট্র যেমন নিয়মতন্ত্র, ইংরেজ রাজা যেমন প্রজামতের অধীন, সকল দেশের রাষ্ট্র ও রাজা সেইরূপ হউক, ষ্টেড্ সর্ব্বদাই ইহা চাহিতেন। তারই জন্য জগতের যেখানে প্রজাস্বত্ব সম্প্রসারণে সঙ্গত প্রয়াস হইতেছে দেখিতেন, যেখানেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্থানে নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আয়োজন বা চেষ্টা হইতেছে শুনিতেন, সেখানেই সেই সকল প্রয়াসের সঙ্গে সর্ব্বদা সহানুভূতি করিতে অগ্রসর হইতেন।

কি পোল্যাণ্ডের, কি ফিন্ল্যাণ্ডের, কি মিশরের, কি ভারতবর্ষের, কি চীনের, কি পারশ্যের, সকল দেশের স্বাধীনতার উপাসকগণ বিলাতে যাইয়া, তীর্থস্থানে যেমন দেশদেশান্তরের যাত্রী মিলিত হয়, সেইরূপ ষ্টেডের বাড়ীতে সম্মিলিত হইতেন। এখানে আফ্রিকার কাফ্রি লোক-নায়ককে দেখিয়াছি। পারশ্যের প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণকেও দেখিয়াছি। যাঁরা তুরস্কের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেখানেও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই সকল ইয়ংটার্ককে (Young Turksকে) এখানে দেখিয়াছি। ফিন্ল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে, সকল দেশে যারা স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিলাতে গেলে, ষ্টেডের বাড়ীতে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত, সেখানে সকলেই মিলিত হইতেন। ষ্টেডের বৈঠকখানা আধুনিক সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠজনের একটা পবিত্র সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই অদ্ভুত সম্মিলন, গৃহস্বামীর উদার মানবপ্রেমেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করিত।

জীবদ্দশায় ষ্টেড যে সকল উন্নত আদর্শের কথা প্রচার করিতেন, মরণ সময়েও তাহারই চরণে আত্মবলিদান দিয়া গিয়াছেন। মরণকালেই মানুষকে সত্যভাবে চেনা যায়। অকূল পাথারে পড়িয়া মানুষের সংসারের সকল আশ্রয় যখন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তার জীবনের সত্যি-কার সাধনটা যে কি ছিল, তাহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ষ্টেডেরও তাহাই হইয়াছে। অবলাকুলের হিতব্রতে ষ্টেড্ যৌবনের প্রারম্ভেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের সাধনেই Maiden Tribute রচিত ও প্রকাশিত হয়। তারই জন্য কারাগারে তাঁর লাঞ্ছনা। অসহায়ের সহায়তা করিতে ষ্টেড্ কখনও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তার শত্রু-রাও এমন কথা বলে না। আর অকূল সমুদ্রে, ভগ্ন অর্ণবতরী বক্ষে, অবলা ও শিশুদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া শেষে ধীর ভাবে, আপনি

সেই জাহাজের সঙ্গে অতলে ডুবিয়া গিয়া ষ্টেড্ সেই পবিত্র জীবনব্রতই উদযাপন করিয়াছেন। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব কোথায়, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দেবত্বটুকু কোন্‌খানে,—টাইট্যানিক জাহাজের এই অন্তিমদৃশ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র দৃশ্য যখন মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তখন আর ইংরেজ জাতিকে অশ্রদ্ধা, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ পালিত

(বঙ্গদর্শন—১৩১৯)

বাংলাদেশের বাহিবে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের নাম এতাবৎকাল যে খুব সুপরিচিত ছিল তাহা নহে। আপনার দীর্ঘ জীবনের সমুদায় সঞ্চিত সম্পত্তি জড়বিজ্ঞানশিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া পালিত মহাশয় আজ একটা ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল তার গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুরুষেরা তাঁর এই অনন্যসাধারণ বদান্যতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "নাইট" শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আজি পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এক হাইকোর্টের জজেরা ব্যতীত অপর কেহ এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। বোম্বাইএ পাবশী ধনকুবেরদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বদন্যতাব জন্য এইরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলায় পালিত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

বহুদিন হইতেই বাংলার লোকে পালিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিয়াছে। অল্প বয়সে বিলাত যাইয়া তিনি বারিষ্টাব হইয়া আসেন। সেকালে বিলাত যাওসা এতটা সহজ ছিল না। আর বাঙালী বারিষ্টারের সংখ্যাও দেশে অতি অল্প ছিল। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় পালিত মহাশয়ের পূর্ব্বেই বারিষ্টার হইয়া আসেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ পালিত মহাশয়েব সমকালীয় লোক। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন ব্যবসায়ে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পালিত মহাশয় তাহা করেন নাই। অথচ পালিত মহাশয়ের শক্তিসাধ্য যে ইঁহাদের অপেক্ষা বড় বেশি হীন ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। ববং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পালিত মহাশয়

ইঁহাদের অপেক্ষা কতকটা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ জগতে সর্ব্বত্রই একটা অদ্ভুত ক্ষতিপূরণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। বিধাতা যাহাকে একদিকে কিছু বেশি দান করেন, অন্যদিকে সেই আতিশয্যের "পাষাণ ভাঙ্গিবার" জন্যই বা বুঝি, তাহাকে কিছু খাট করিয়াও রাখেন। একটু তলাইয়া দেখিলে অনেক বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার থাকে, ধীরতা তার তেমন থাকে না। সহজে যে জটিল বিষয় ধরিতে বা বুঝিতে পারে, গভীর বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোনিবেশ করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তার প্রায় দেখা যায় না। মেধা ও শ্রমশীলতা ক্বচিৎ একসঙ্গে বসবাস করে। পালিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মেধাই বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর ব্যবসায়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বলাভের অন্তরায় হইয়াছিল। আর এইজন্যই তিনি অধিকাংশ সময় ফৌজদারী মামলাতেই নিযুক্ত হইতেন। ফৌজদারী মামলায় এক সময়ে বাঙালী বারিষ্টারদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মতন এমন সুদক্ষ লোক আর কেহ ছিলেন না, বলিলেও হয়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তি কতকটা বেশি ছিল সত্য, কিন্তু ঘোষ মহাশয় কেবল আপনার ব্যবহারকুশলতাগুণে এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। ঘোষ মহাশয়ের যে কর্ম্মকুশলতা, যে লোকরঞ্জনশক্তি, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ছিল, সে সকল গুণ সে মাত্রায় পালিত মহাশয়ের থাকিলে, তিনি কোনও অংশে যে ঘোষ মহাশয় অপেক্ষা অল্প খ্যাত্যাপন্ন হইতেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে এ সকল "যদি"র স্থান নাই। তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের উপযোগী শক্তিসাধ্য দান করিয়া থাকে। একদিকে কাহাকে একটু কিছু বেশি দিলে আর একদিকে একটু কাটিয়া ছাটিয়া সমান করিয়া দেয়। ঘোষ মহাশয়ের যাহা ছিল

পালিত মহাশয়ের তাহা ছিল না, আর পালিত মহাশয়ের যাহা আছে, ঘোষ মহাশয় তাহা পান নাই, এইরূপ গড়ে মানুষ একটা বিচিত্র ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের অনেক শক্তিসাধ্য আছে——যে সকল শক্তিসাধ্য থাকিলে লোকে ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ করে, পালিত মহাশয়ের তাহা বিলক্ষণ ছিল। আর যে সুযোগ পাইলে এ সকল শক্তিসাধ্য সফলতা লাভ করিয়া থাকে, পালিত মহাশয়ের ভাগ্যে সে সুযোগও যে জুটে নাই, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে এ সকল শক্তি এবং সুযোগ সত্ত্বেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। লোকে সচরাচর ব্যবহার-ব্যবসায়কে স্বাধীন ব্যবসায় বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু এখানেও যে স্বাধীনতার খুব আদর থাকে বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব এমন বলা যায় না। উকিল বারিষ্টারকেও আদালতের মুখ চাহিয়া এবং হাকিমের মর্জ্জি বুঝিয়া চলিতে হয়। না পারিলে ব্যবসায় চলা ভার হইয়া উঠে। আর অনন্যসাধারণ আইনজ্ঞতা বা কর্ম্মকুশলতাগুণে ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও সকল সময়ে সমব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করা সম্ভব হয় না। পালিত মহাশয় চিরদিনই অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লোকের মুখ চাহিয়া চলিবার কৌশলটী তিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। যে নম্রতা থাকিলে এ শিক্ষা সহজ হয়, পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে তাহা ছিল না এবং নাই। খাতির কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। চক্ষুলজ্জা-বস্তুটাও তাঁর আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এসকল যে উকীল বারিষ্টারের নাই, তাঁর পক্ষে আপনার ব্যবসায়ে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা আদৌ

সম্ভবে না। পালিত মহাশয়ের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। মনে হয় যেন সহজেই তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং—মহাভারতের এই সমীচীন নীতি অনুসরণ করিয়া চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মোলায়েম করিয়া কথা বলার অভ্যাসটা তিনি কখনও লাভ করেন নাই। আর এই জন্যই এত শক্তি সাধ্য থাকিতেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

আর ঠিক এই কারণেই দেশের তথাকথিত জনহিতকর কর্ম্মেও পালিত মহাশয় এ পর্য্যন্ত নেতৃ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। এ আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁর কখনও ছিল এরূপত মনে হয় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় জীবনের শেষ ভাগে, আর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় আযৌবনই দেশহিতকর অনুষ্ঠানে লিপ্ত ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যাবধিই লোকমত-গঠন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, যখন তিনি অজাতশ্মশ্রু যুবকমাত্র, তখনই "ইণ্ডিয়ান মিরার" (Indian Mirror) পত্রের সম্পাদকীয় ভার বহন করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন সাপ্তাহিক ছিল; তার বহুকাল পরে দৈনিক আকারে পরিণত হয়। কিন্তু সে কালে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনাও সামান্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন নবোদিত ব্রহ্ম-সমাজের মুখপত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চে যে সুর জাগাইতেছিলেন, ইণ্ডিয়ানমিরারের স্তম্ভে সেই সুরই ভাঁজিতে হইত। ইহাতেই একদিকে মনোমোহনের শক্তিসাধ্যের ও অন্যদিকে লোক-হিতব্রতে তাঁর কি যে গভীর অনুরাগ ছিল তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমোহন এইরূপে প্রথম যৌবনাবধিই লোকনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাভিলাষ আমরণ পর্য্যন্ত তাঁহার

অন্তরে জাগরূক ছিল। কিন্তু পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ বস্তুটা কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ, যে সকল সরঞ্জাম থাকিলে লোকে জননায়কের পদলাভ করিতে পারে, পালিতমহাশয়ের সে সকল সরঞ্জামও কখনও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেমন ব্যবহারব্যবসায়ে হাকিমের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে হয়, সেইরূপ জননেতৃলাভ কবিতে হইলে অনেক সময় জনগণের মন যোগাইয়া চলা আবশ্যক হয়। যাঁহারা অনন্য-সাধারণ বাগ্মীতাশক্তি বা সাহিত্য-প্রতিভার গুণে প্রথমে অগঠিত লোকমতকে প্রবুদ্ধ ও গঠিত করিয়া সেই সংহত জনশক্তির অগ্রণীরূপে লোকনায়কের পদলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে লোকমতানুবর্ত্তিতা না করিয়াও সেই পদ রক্ষা করা সম্ভব হইতে পাবে। কিন্তু যাঁহাদের এ শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে লোকমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হইয়া না চলিতে পারিলে, আধুনিক দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রণীদলভুক্ত হওয়াব সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা লোকনেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন. একদিকে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যদিকে কিয়ৎপরিমাণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর প্রায় সকলকেই স্বল্পবিস্তর লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হইয়াছে। আর সুরেন্দ্রনাথও এক সময়ে যতটা স্বাধীন ছিলেন, পরে সে স্বাধীনতা ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে লোকে এরূপ ভাবে, পদ ও প্রতিপত্তির লোভেও আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে সে গুণ নাই। যে স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি আপনার ব্যবসায়ের চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই, সেই স্বাধীনচিত্ততার জন্যই তিনি আমাদের আধুনিক সমাজসংস্কারের বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর দলে নেতৃত্বলাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ কোনও আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে কখনও জাগিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ পালিত

মহাশয় নিজের পরিবারে আর দশজন বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুর মতন আধুনিক সমাজসংস্কারের আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল লইয়া একটা হুজুগ করেন নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনাতেও তিনি এইরূপেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন। প্রয়োজন মত কংগ্রেসের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থদান করিয়াছেন। তাঁর সমশ্রেণীর আর দশজনে যেমন এ সকল ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, পালিত মহাশয়ও সেরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল দানের জন্য কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার কোন লিপ্সা তাঁর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ফলতঃ এরূপ নেতৃত্বলাভের যোগ্যতাও তাঁর নাই; কিন্তু পালিত-মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসার কথা এই যে, তিনি আপনার ঠিক ওজনটা জানেন। তিনি কি করিতে পারেন ও কি করিতে পারেন না, ইহা যেমন পরিষ্কাররূপে জানেন, তাঁর সমশ্রেণীর লোকেরা অনেকেই তাহা জানেন না। এই জন্যই যাঁর যে কার্য্যের কোনও শক্তি ও সরঞ্জাম নাই, সেও আপনার পদের বা ধনের জোরে সে কার্য্যে কেবল হাত দেয় যে তাহা নহে, একেবারে নেতৃত্ব পদে যাইয়া চড়িয়া বসিতে চাহে। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় হাম্‌বা বলে। এই বস্তু হইতেই ইংরেজের হাম্বাগিজমের (Humbugismএর) উৎপত্তি হয়। যার প্রকৃতির ভিতরে এই বাঙ্গলা হাম্‌বাটী নাই, তার পক্ষে ইংরেজি হাম্বাগিজম করিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। যার যে শক্তি নাই, সে সেই কাজ করিতে গেলেই হাম্বাগ (Humbug) হইয়া উঠে। যার প্রকৃতিগত আস্তিক্য বুদ্ধি নাই সে যদি ধার্ম্মিকের আসনে যাইয়া বসিবার জন্য লালায়িত হয়; যাঁর বাক্‌শক্তি নাই সে যদি করতালি লাভের লোভে বক্তৃতামঞ্চে যাইয়া দাঁড়াইতে চাহে; যার বিনয় স্বভাবসিদ্ধ

নয় সে যদি বিনয়ীর যশলিপ্সায় এই মহৎ গুণের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হয়; যার বুদ্ধি ও বিদ্যা নাই, আছে কেবল ধনের উত্তাপ, সে যদি লোকমতপরিচালনার জন্য জননেতৃত্ব দাবী করিতে আরম্ভ করে;—তাহা হইলে তার পক্ষে এই হাম্‌বার জন্য হামবাগ্‌ না সাজা অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। পালিত মহাশয়ের মধ্যে এরূপ কোন হাম্‌বা নাই বলিয়া, তিনি এই হুজুগের যুগেও এ পর্য্যন্ত হাম্বাগ্‌ হইয়া উঠেন নাই।

তাঁর রুক্ষ্ম স্বভাবের জন্য পালিত মহাশয় নিজের ব্যবসায়ে যেমন অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও কোনও প্রকারের নেতৃত্বমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। আর এই জন্য তাঁর মেধার বা চরিত্রের প্রভাবও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোরাজ্যেও কোনও প্রকারের আধিপত্য লাভ করে নাই। ফলতঃ ইংরাজিতে যাহাকে public man বলে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত সে জাতীয় জীব নহেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে লোকনেতৃত্ব লাভ করিবার কোনও উপকরণও নাই। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে, আশৈশবই তিনি অশেষ প্রভুত্বভোগ করিয়া আসিয়াছেন, অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বহুকালাবধিই জানা গিয়াছে। আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগের উপরে তাঁর একটা মোহিনীশক্তিরও পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা পালিত মহাশয়ের সকল প্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়া চিরদিন তাঁর মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন। একবার যে তাঁর বন্ধুতালাভ করিয়াছে চিরদিন পালিত মহাশয়, প্রাণপণে তাঁহার প্রতি সুহৃদজনোচিত সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। অন্য পক্ষে তাঁর শত্রুতা যে একবার করিয়াছে, বা তাঁর বন্ধুবান্ধবদিগের কোনোও প্রকারের অনিষ্টের চেষ্টাতে যে একবার লিপ্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত জীবনে

কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা অল্প, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁর .শত্রু বা অসম্পর্কিত লোকের প্রতি পালিত মহাশয় কখনও উদার ও কোমল ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁর প্রাণটা যে খুব কঠোর এমনও মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ এই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কোমলচিত্ততারও অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন পালিত মহাশয়কে নিরতিশয় কঠোর প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে সময়ে সময়ে তাঁর সেইরূপ অসাধারণ কোমলতারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের সম্বন্ধেই যে তিনি নিরতিশয় কোমলচিত্ততার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নহে; কখনও কখনও নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোক-দিগের প্রতি গভীর ও উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে তাঁর বক্ষে দরবিগলিত-ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা স্বচক্ষে ইহাব প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সেই দিন একটী যুব-কের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া পালিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ আমাদের মধ্যে আর কাহারও সে জন্য অশ্রুপাত হয় নাই। পালিত মহাশয়ের আপাতঃ কঠোবতা ও রুক্ষ স্বভাবের সঙ্গে এই ভাবোচ্ছ্বাসের যতটা অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, ফলতঃ ততটা অসঙ্গতি এ দু'য়ের মধ্যে একেবারে নাই। দুইই ভাবুকতার লক্ষণ। যাঁরা অতি সহজে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাঁরা যে বস্তুতঃই অতিশয় নির্ম্মমপ্রকৃতির লোক. তাহা নহে। প্রকৃত নির্ম্মম লোকেরা লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, কিন্তু হঠাৎ কাহারো উপরে চটিয়া যায় না। যাঁদের প্রাণ নিরতিশয় কোমল তাঁরাই একদিকে সহজে ক্রোধের বশবর্ত্তী হন, আর অন্যদিকে স্নেহমমতার আবেগেও আত্মহারা হইয়া যান। এ বস্তুটী অনেক লোকহিতব্রত মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। পুণ্যশ্লোক

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর যেমন সহজে চটিয়া যাইতেন, সেইরূপ অতিসহজেই আবার গলিয়া যাইতেন। ফলতঃ কোনও কোনও বিষয়ে পালিত মহাশয় বিদ্যাসাগর চরিত্রকে স্মরণ করাইয়া থাকেন। অবশ্য দুজনার এক নিক্তিতে তৌলকরা চলে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবত্ব পালিত মহাশয়ের মধ্যে সব দেখা যায় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানুষী ভাবগুলি অনেক সময় পালিত মহাশয়ের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন; পালিত মহাশয়ের স্বাধীনচিত্ততাও লোকপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতে পারিতেন না; পালিত মহাশয়ও তাহা পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমলচিত্ততাও কিয়ৎপরিমাণে পালিত মহাশয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ব্রহ্মণ্যপ্রকৃতিসুলভ যে নিতান্ত নির্লোভ ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এতটা বড় করিয়াছিল, রজতপ্রধান সভ্যতার আদর্শে অভিভূত, ব্যবহারজীবী পালিত মহাশয়ের মধ্যে সে নির্লোভ ও সে ত্যাগের প্রমাণ কেহ কখনও অন্বেষণ করিতে যায়ও নাই, কেহ কখনও পায়ও নাই, আর শেষজীবনে পালিত মহাশয় যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহও বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী ত াগের সমজাতীয় বস্তু নহে। এ ত্যাগেও বিলাতী গন্ধ আছে, বিদ্যাসাগরের ত্যাগে সাত্বিকতাপ্রধান ব্রাহ্মণ্য আভাও দেখা যাইত। কিন্তু এ পার্থক্য সত্বেও, বাংলার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে উভয়েই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আর পালিত মহাশয় জীবনের সন্ধ্যাকালে এইরূপ ভাবে আপনার যথাসর্ব্বস্ব স্বদেশী যুবকগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য দান করিয়া, প্রথম জীবনে সঞ্চিত সমুদায় কুযশকে একান্তভাবে ক্ষালন করিয়া, বাংলার আধুনিক সমাজের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একাসনে নহে, কিন্তু একই মন্দিরে, অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

টাইট্যানিকের তিরোধান

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের ব্যবধানটা যে কত সূক্ষ্ম ও সামান্য, সংসারমোহবিভ্রান্ত মানুষ সকল সময়ে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই বুঝি বিধাতাপুরুষ মাঝে মাঝে টাইট্যানিকের তিরোধানের মত লোমহর্ষণ বিধানের ব্যবস্থা করিয়া, আত্মবিস্মৃত জনগণের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া দেন। সভ্যতা বলিতে আমরা আজি কালি যে বস্তুকে বুঝিয়া থাকি, তাহা একান্তই ইহ-সর্ব্বস্ব। এই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবেব চিন্তা ও কল্পনার উপরে প্রত্যক্ষ পুরুষকারেব প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া, অপেক্ষাকৃত "অসভ্য" প্রাচীন সমাজে দৈবের উপরে যে একটা ঐকান্তিক নির্ভর ছিল, তাহা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া, একেবারেই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি, তার আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা, যতই তাহাকে বাহিরের শক্তিপুঞ্জের প্রভু ও নিয়ন্তা করিয়া তুলিতেছে, যতই মানুষ আপনার বুদ্ধি-বলে দেশ-কালের নৈসর্গিক ব্যবধান, জল-স্থলের অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরায়, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, এ সকলকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইতেছে, ততই তার আপনার উপরে নির্ভরটা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্ভরটাই আধুনিক সভ্যতার একটা অতি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং এরূপ সভ্যতা যে "আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতা" হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এ সভ্যতাকে মাঝে মাঝে এরূপ ভাবে নাড়া না দিলে, তার চৈতন্যোদয় হইবে কেন?

য়ুরোপ ভাবিতেছিল যে সে আপনার অলৌকিক অধ্যবসায় ও

অসাধারণ বুদ্ধির জোরে নিসর্গের প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জকে করায়ত্ত করিয়া ক্রমে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিবে। টাইট্যানিকের তিরোধানে, ক্ষণিকের জন্য তার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা এ পথে মৃত্যুকে জয় করিতে যাই নাই। আমরা যাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মহাবৈরাগী, তিনি দ্বন্দাতীত, মৃত্যু ও অমৃতে তাঁর সমান-জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব-শিব তাঁর ভিতরে এক হইয়া গিয়াছে। আমাদের মৃত্যুকে জয় করিবার পথ ছিল—যোগের পথ, ভোগের পথ নহে; ত্যাগের পথ, লোভের পথ নহে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

"যে সকল কামনা এই মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন একান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়, তখনই মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এইখানেই ব্রহ্মকে ভোগ করিয়া থাকে।"

আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাকেই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। "ত্যাগেনৈবমৃতত্বমনাশুঃ" কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তার আর অন্যপথ নাই, ভারতের আর্য্যসভ্যতা ও সাধনার ইহাই সার কথা ও শেষ কথা। জগতের সকল সাধু ও সিদ্ধপুরুষেরাই এ কথার সত্যতার ও সারবত্তার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় সাধনায়ও এ কথাটা নতন নহে। যিশুও এই ত্যাগের পথই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভোগের পথ দেখান নাই। "তোমার যা' কিছু তৎসমুদায় বিকাইয়া দিয়া, আমার অনুগামী হও,"—"যদি সে' জীবন পাইতে চাও, তবে এ'জীবন বিসর্জ্জন দাও";—কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, আজিকার দুর্ভাবনাই আজিকার জন্য যথেষ্ট";—খৃষ্টের এ সকল প্রসিদ্ধ উপদেশ,—এবং পরিণামে যে ভাবে তিনি এই মহাত্যাগ-

যজ্ঞে আপনার পবিত্র দেহ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আর এইরূপ ভাবে দেহ রাখিয়া আপনার "পুনরুত্থান" বা রিসরেক্‌সণের (Resurrection) ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান্‌মণ্ডলীকে তিনি স্বয়ং অমৃতত্বের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও আমাদেরই এই প্রাচীন ও সার্ব্বজনীন ঋষিপন্থা। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"।

টাইট্যানিকের তিরোধান সংসার মোহ-বিভ্রান্ত য়ুরোপীয় সমাজকে, অপূর্ব্ব কলাকুশলতা সহকারে, এই সনাতন ঋষি-পথ ও পুরাতন যিশুপথই দেখাইয়া দিয়া গেল। যারা আজন্মকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল ভোগের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল, যাহাদিগকে তুনিয়ার লোকে ইহ-সর্ব্বস্ব বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে আসুরী-সম্পদ বলিয়াছেন, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আসুবীভাবেব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আহবণ করিতে যাহারা আপনাদেব সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইত, সেই সকল লোককে বুকে লইয়াই টাইট্যানিক তার এই মহাপ্রয়াণে যাত্রা করিয়াছিল। আধুনিক সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা ও বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতা মিলিয়া এই বিপুল অণবযানখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। একদিন য়ুরোপ হইতে আটল্যান্টিক মহাসাগব পার হইয়া আমেরিকায় যাইতে এক পক্ষ কাল লাগিত। ক্রমে তাহা এক সপ্তাহে আসিয়া দাঁড়ায়; বৎসর তুই কাল হইল, এ ব্যবধান আরও কমিয়া গিয়াছিল। তুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করে; একের নাম "কিউন্যার্ড" (Cunard), অপরের নাম "হোয়াইট ষ্টার" (White Star)। কিউন্যার্ড কোম্পানীর মরিট্যানিয়া (Mauritania) নামক নূতন জাহাজ প্রথমে, পাঁচ দিন কয়েক ঘণ্টায়, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। সপত্নী কোম্পানীর এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া,

হোয়াইটষ্টার (White Star) কোম্পানীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই প্রতিযোগিতার প্রেরণাতেই "টাইট্যানিকের" জন্ম হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রতিদিনই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। "মরিট্যানিয়া" যখন নির্ম্মিত হয় তার পরে, এই দুই বৎসর কি তিন বৎসর কালের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বা যন্ত্রের যাহা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হইয়াছে, "টাইট্যানিক" সে সকলের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আয়তনে ও গতি-শক্তিতে, সাজসজ্জার বিচিত্রতায় ও ভোগবিলাসের আয়োজনে, সকল বিষয়েই "হোয়াইট ষ্টার" কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ "টাইট্যানিক"কে অর্ণবপোতের সেরা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরোহীগণের সুখের ও সখের ব্যবস্থা করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। জাহাজখানিকে এমনভাবে গড়িয়াছিলেন, তার ভিতরে এমন সকল কলকৌশল রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার ডুবিবার কোনও আশঙ্কাই ছিল না। আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বের উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্দ্ধা সহকারে যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারের সুখসৌখিনতার ও ভোগবিলাসের লোভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্র-যাত্রার সর্ব্ববিধ বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে একান্ত অভয়দান করিয়া, আপনাদের নিয়ন্তৃসমিতির বা Board of Directors' এর সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী, কর্ম্মচারী ও নাবিক সকলে মিলিয়া প্রায় তিন হাজার স্ত্রীপুরুষ লইয়া, হোয়াইট্ষ্টার কোম্পানী টাইট্যানিককে আটল্যান্টিকের বুকে ভাসাইয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে অদৃশ্য ঈথর-স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িৎ-বার্ত্তা সাগর-বক্ষঃস্থ টাইট্যানিকের গতিবিধির সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছিল, তার বুকের উপরে সহস্রাধিক

নরনারীও সেইরূপ ভয়ভাবনা-বিরহিত হইয়া, হাস্যপরিহাসে, নাচে গানে, দিন কাটাইতেছিলেন। এইরূপেই এই বিশাল প্রাণের পসরা সাজাইয়া "টাইট্যানিক" আনন্দে আপনার গন্তব্যের দিকে, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

কিন্তু তার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার যে গন্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না। সভ্যতার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব হরণ করিবার জন্য, বিষয়বিমূঢ় জনগণের চিত্তে সাড়া আনিবার জন্য, পুরুষকারের উপরে যে দৈব আছেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্য, সংসারমোহবিভ্রান্ত স্বরূপভ্রষ্ট সভ্য জীবের স্বরূপচৈতন্যের সঞ্চার করিবার জন্য, কামোপভোগপরমা সভ্যতা ও সাধনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য, "নান্যদস্তীতিবাদী" ইহ-সর্ব্বস্ব জনগণের প্রাণে অমৃতত্বের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, ভোগসর্ব্বস্ব সমাজকে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য—বিধাতাপুরুষ টাইট্যানিকের আর এক গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইট্যানিক্ সে সাংঘাতিক নিয়তি প্রাপ্ত হইয়াই আপনার চরম সার্থকতালাভ করিয়াছে।

সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। আকাশে মেঘ নাই। অগণ্য নক্ষত্ররাজি দশদিক্ পূর্ণ করিয়া হীরার হাট খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশির অন্ধকারও নাই। শান্ত সুপ্রসন্ন প্রকৃতিমুখে নির্ম্মমতার আভাস মাত্র নাই। অপূর্ব্ব রচনাকৌশলগুণে বিপুলকায় অর্ণবপোতের জলমগ্নের আশঙ্কার লেশমাত্র নাই। তড়িতালোকসমুজ্জ্বল, বিবিধ কলাকুশলপূর্ণ প্রমোদপ্রয়াসমুখরিত ইন্দ্রপুরীর-ন্যায় অর্ণবপোত আশ্রয় করিয়া দ্বিসহস্রাধিক আরোহী নির্ভয়ে ও নিশ্চিত মনে অকূল জলরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। কেহ বা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতালাপ করিতেছে। কেহ

বা আরামচৌকিতে বসিয়া নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে, আর কেহ বা ডে'কের উপরে পাদচারণ করিতে করিতে প্রণয়ীজনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। কেহ বা ধনের কেহ বা দারিদ্র্যের, কেহ বা প্রেমের কেহ বা প্রতিযোগিতার, কেহ বা জ্ঞানের কেহ বা ললিতকলার, কেহ বা সখ্যের কেহ বা সখের ভাবনা ভাবিতেছে। দুনিয়ার সকল ভাবনার বোঝা লইয়া টাইটানিক শান্ত সমুদ্রাম্বুরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে—নাই কেবল সে বিচিত্র পসরায় এক মৃত্যুর ভাবনা। সহসা যখন মরণের ডাক পড়িল, জাহাজের কল যখন বন্ধ হইয়া গেল, আরোহী-গণের প্রাণরক্ষার জন্য লাইফ্-বোট (Life-boat) বা জীবনতরণীগুলিকে জলে নামাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, সকলকে ডেকে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্য যখন কাপ্তানের হুকুমজারী হইল, তখনও সকলের প্রাণে সাড়া পড়িল না। কালের ভেরী বাজিল, তথাপি অনেকে ক্রীড়াকৌতুক ছাড়িল না, অনেকের গীতবাদ্য থামিল না। বিজ্ঞানের প্রামণ্যকে নষ্ট করিয়া, সভ্যতার অসাধারণ কৃতিত্বাভিমানকে চূর্ণ করিয়া, স্থির সমুদ্রে, নির্ম্মল আকাশ তলে, টাইটানিক যে সহসা অতলে ডুবিবে বা ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এ কল্পনারও উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ যে সত্য, মৃত্যু যে সন্নিকট এ বিষয়ে তিল পরিমাণ সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখনও যে কেন এই দ্বিসহস্রাধিক আরোহী এবং নাবিকেরা ভয়-বিক্ষিপ্ত হইয়া, শৃঙ্খলমুক্ত পশুর ন্যায় কে কাহাকে মারিয়া আপনকে বাঁচাইবে সে চেষ্টায় জাহাজখানিকে কলহকোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিল না, এ রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে আধুনিক সভ্যতা হয় মানুষকে সর্ব্বপ্রকারের সাধারণ মানব ধর্ম্ম-বিরহিত করিয়া জিহ্বোপান্ত-সমন্বিত কাষ্ঠলোষ্ট্রে পরিণত করে, না হয় দেবত্বে উন্নীত করিয়া তোলে।

এ সকল কি মোহের না মোক্ষের লক্ষণ? টাইট্যানিকে যাহা দেখিলাম তাহা কি জড়ত্ব না বীরত্ব?

আর এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে আমরা য়ুরোপকে সচরাচর ইহ-সর্ব্বস্ব বলিয়াই মনে করি। য়ুরোপ ভোগের সন্ধানই পাইয়াছে, ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও লাভ কবিতে পারে নাই, অনেক সময়ে আমরা এরূপই ভাবিয়া থাকি। সুতরাং টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ যাহা দেখাইল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা সহজে ধরিয়া উঠিতে পারি না। কখনো মনে হয়, আমরা য়ুরোপকে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর কখনো মনে হয়, বুঝি বা টাইট্যানিকের তিরোধানেব যে কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে কল্পিত। ফলতঃ আমাদেব পূর্ব্বধারণাও একান্তই মিথ্যা নহে; আব আজ যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নিতান্তই কল্পিত নহে। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে ত্যাগেব পথ ধরিয়া যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে, য়ুরোপ যে সে পথেরই সন্ধান পাইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরো ধানে ইহা প্রমাণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিনই ত্যাগের পথ। য়ুরোপের পথ চিরদিনই ভোগের পথ। ভারতের যতই কেন আত্মবিস্মৃতি জন্মাক্ না, সে কখনো একান্তভাবে য়ুরোপের ভোগের পথ ধরিতে পারিবে না। আর য়ুবোপেব যতই কেন ক্ষণিক শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হউক না, সেও কখনো ভারতের এই প্রাচীন ত্যাগের পথ ধরিতে পারিবে না। ভারত যদি য়ুরোপের অদ্ভুত অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার ভোগের পথ ধরিতে যায়, তাহাতে আত্মচরিতার্থ লাভ করা দূরে থাকুক, সে নিষ্ফল প্রয়াসে তাহার ভাগ্যে কেবল আত্মঘাতী পরধর্ম্ম লাভই ঘটিবে। আর য়ুরোপও যদি ভারতের প্রাচীন পারমার্থিক সম্পদের অতিলৌকিক শক্তিদর্শনে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের

পরধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়, সে প্রয়াসও তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াই উঠিবে।

ফলতঃ কি ভারতের কি য়ুরোপের পক্ষে এইরূপ পরধর্ম্মানুশীলনের কোনই প্রয়োজনও নাই। কারণ মানবপ্রকৃতির মৌলিক একত্বনিবন্ধন, মানুষ আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, নিষ্ঠাসহকারে যে পথেই চলুক না কেন, পরিণামে সেই মূল প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হইবে; ইহাব অন্যথা হওয়া অসম্ভব। সকল নদীই যেমন একই সাগরগর্ভে যাইয়া আপনার চরিতার্থতা লাভ করে, সেইরূপ সকল মানবীয় সাধনাই ঋজুকুটীলভাবে, নানা পথ অতিক্রম করিয়া, পরিণামে যে মনুষ্যত্বে মানবপ্রকৃতিমাত্রেরই সার্থকতা লাভ হয় সেই মনুষ্যত্বকেই প্রাপ্ত হয়। য়ুরোপের প্রবাদে একটী কথা আছে—সকল পথই চরমে রোম নগরে যাইয়া পৌছায়। সেইরূপ সার্ব্বজনীন মানব ইতিহাসেরও সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বপ্রকারের মানবীয় সাধনাই চরমে একই পরম মনুষ্যত্ব বস্তুকেই ফুটাইয়া তুলে। ত্যাগে যেমন ত্যাগের পরিসমাপ্তি হয় না, নিষ্কাম ভোগে যাইয়াই ত্যাগ আপনার সার্থকতা লাভ করে; সেইরূপ ভোগও আপনার চরিতার্থতার জন্যই ক্রমে ত্যাগের পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং আদিতে যে ভোগ কাম্য-বিষয়ের অনুসরণ করিয়া চলে, ক্রমে ত্যাগের পথ ধরিয়া তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার আত্যন্তিক ভোগলালসা আপনার চরিতার্থতার জন্যই যে সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানকালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আধুনিক ভোগের আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের সমবেত শ্রম ও সাহচর্য্য প্রয়োজন হয়। টাইট্যানিক আপনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এত বড় বিপুলকায় অর্ণবযান পরিচালনার জন্য বহুলোকের

আবশ্যক হয়। এই বহুসংখ্যক নৌ-কর্ম্মচারী ও নাবিকদিগের পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের কর্ম্মাকর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবস্থার উপরেই যখন এত আরোহীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনমরণ নির্ভর করে, তখন এসকলের বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কঠোর শাসনেরও প্রয়োজন হয়। এক এক খানি সমুদ্রগামী জাহাজ এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের মত। কাপ্তান সেই রাজ্যের রাজা। জাহাজের কর্ম্মচারী এবং আরোহী সকলকেই কাপ্তানের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হয়; না চলিলে জাহাজ-পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের প্রাণরক্ষা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সেনাশিবিরে প্রত্যেক সেনাপতির যে প্রভুত্ব ও অধিকার, সমুদ্রগামী জাহাজের কাপ্তানের সেইরূপ অধিকার ও প্রভুত্ব রহিয়াছে। এখানে নাবিক এবং আরোহী সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,—জাহাজের কাপ্তান। যাহারা এই সকল জাহাজে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে ও এই সকল জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই জাহাজের বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে ও কাপ্তানের আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। এই সংযমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও টাইট্যানিকের দ্বিসহস্রাধিক আরোহী ও নাবিক বিন্দুমাত্র ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই।

এ তো গেল বিশেষ ব্যবস্থার ও বিশেষ বিধানের কথা। ইহার অন্তরালে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মও বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতা ও সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রধান হউক না, ইহার পারমার্থিক দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও, পরার্থপরতা বস্তুতঃ সামান্য নহে। বিধাতার রাজ্যে অত্যন্ত ভোগী যে সেও কখনও নিতান্ত

একাকীত্বের মধ্যে কিছুই ভোগ করিতে পারে না। জনসমাজই একদিকে যেমন ত্যাগের, অন্যদিকে সেইরূপ ভোগেরও একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। একান্ত একাকী হইয়া যে থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পায় না, সেইরূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে না। ভোগের মাত্রা যতই বাড়িয়া যায়, ততই দশজনকে মিলাইয়া, দশজনের শক্তি সাধ্যের সমবায়ে সেই ভোগের আয়োজনও করিতে হয়। আর এইরূপে দশজনে মিলিয়া কোনো কিছু করিতে গেলেই প্রত্যেকের স্বার্থপরতাকে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই, কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। এই সমবায়ের সূত্র ধরিয়াই য়ুরোপ এতটা অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আর দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে যাইয়াই য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতারও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে দেশের জন্য ও দশের জন্য ত্যাগস্বীকার করা য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার একটা সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই য়ুরোপের জাতীয় চরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধান কালে আমরা এই সকলেরই একটা অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। ত্যাগের পথে যাইয়া ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ভোগের পথে যাইয়া য়ুরোপ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। ভারত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মা সাধন করিয়া আপনি সুখদুঃখের অতীত হইয়াও জগতের সুখকেই আপনার সুখ ও জগতের দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগূঢ় সঙ্কেত লাভ করিয়াছিল। এই মহাপরিনির্ব্বাণের সুখদুঃখের তত্ত্ব য়ুরোপ জানে না। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক সভ্যতা রাখে না। কিন্তু আপনি সুখ চাহে বলিয়াই, অপরাপর অপরকেও সুখী করিতে চাহে এবং আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে বলিয়াই, সে নিজের

যাতনা জানে এবং তাহারই জন্য জগতের দুঃখীতাপীর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে এবং সেই দুঃখ ও সেই বেদনা উপশম করিবার জন্য কখনও কোনও শ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতেও বিমুখ হয় না। টাই-ট্যানিকের তিরোধানে কি করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে হয়, তাহাই দেখিলাম। কেমন করিয়া অপরের সুখে সুখানুভব ও অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম। কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাইয়াও যে অসাধারণ সংযমের প্রয়োজন হয় এবং এই অপরিহার্য্য সংযমের মধ্য দিয়াই যে অতি উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং এই পথে যাইয়াও যে সুকৃতিসম্পন্ন লোকে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ লাভ করিতে পারেন, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহাও দেখিলাম। এ সকল দিকেই আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টাইট্যানিক আধুনিক য়ুরোপের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অন্যতম নিদর্শনরূপে গঠিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় কর্ম্মিগণের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সগর্ব্বে সাগরবক্ষে ভাসিয়াছিল। আর য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ব ভোগপ্রধান সাধনার মূলেও সে ভাগবতীলীলাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠতম যোগশক্তি ও মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলি-তেছেন, ইহা প্রমাণ করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে অন্তর্হিত হইয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান্ ও জগৎ লাভবান্ হইয়াছে।